অভিশপ্ত

শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্ত

প্রকাশক—
শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী,
যুগবাণী-সাহিত্য-চক্র
১৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চৈত্র-সংক্রান্তি ১৩৩৭

মুদ্রাকর—
শ্রীশূলপাণি চক্রবর্ত্তী,
ঘোষ প্রেস
৩৮ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

দাম এক টাকা

পথ চলার যাঁরা ক্ষতবিক্ষত সেই সব আপন ভোলা

ছন্ন ছাড়া প্রবাসী বাঙালী

ভাইদের হাতে—

অভিশপ্ত

পথের নেশা

=এক=

পাগল ?—হ্যা পাগল বই আর কি, তা' না হ'লে আশ-পাশের, চেনা অচেনা সকলে ঐ একই কথা বলবে কেন ?

আচ্ছা, পাগল কথাটা কি আমার গায়ে লেখা আছে—না পাগলামীর নিয়ম জ্বলন্ত ছাপ আমার সর্বাঙ্গে এমনই দেওয়া আছে যা দেখে চিনতে লোকের কিছুমাত্র দ্বিধা সঙ্কোচ আসে না ?......

এক এক সময় ভাবি—হয়তো বা সত্যই হবো, আর তা' যদি নাই-ই বা হবো তবে,—এতো বড়ো দুনিয়াটার কোথাও তো ঘুরতে বাকী রাখিনি,—অলি গলি থেকে সুরু ক'রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সহর পর্য্যন্ত—সকলে ঐ একই কথা কেন বলবে ?

......এদের কাণ্ড দেখে এক এক সময় এতো হাসি পায়,...... থাকতে পারি না,—হো-হো ক'রে হেসে উঠি ;......আচমকা ফিরে দেখি সে শব্দে চমকে ওঠা অবাক-বিস্ময় ভরা হাজার হাজার চক্ষু আমার প্রতি চেয়ে আছে।—গম্ভীর হ'য়ে হন্ হন্ ক'রে সে স্থান পরিত্যাগ করি—তখনও যেন আমার কানে তাদের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসে—পাগল পাগল, বদ্ধ পাগল !

অভিশপ্ত

—রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে,......দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তেড়ে গিয়ে বলি,—তোদের কি বেটারা, আমার খুসী আমি হাসবো তোরা তার কি বুঝবি? তোদের কি কারুর প্রাণ আছে—না সে প্রাণে আমার মতো আনন্দ আছে যে প্রাণ খুলে হাসবি?...

—ছোট ছোট ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে,—হাততালি দিয়ে বলে—পাগলা রে পাগলা!...

—পাগল—পাগল—পাগল!—

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হ'য়ে উঠেছে,—মাঝে মাঝে মনে হয়—পাগল যদি সত্যই হ'তে হয় তা হ'লে এদের জন্যেই হ'তে হবে। দশচক্রে ভগবান ভূত হ'য়েছিলেন কি না জানি না কিন্তু মানুষ সেই চক্রে পড়ে ভূত না হ'লেও পাগল যে হ'তে পারে তা নিজের জীবন দিয়েই বেশ বুঝতে পারছি!

সে দিন কতকগুলি লোকের বিদ্রূপে মন তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠলো—মরিয়া হ'য়ে ছুটে গেলাম পাশের ঐ পানওয়ালার দোকানে টাঙানো বড় আয়নাটার সামনে; অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচাই ক'রে দেখলাম, যে, অপরের চেয়ে আমার শরীরের বৈশিষ্ট্যটা কোথায়,—কোন জায়গাটা অন্যের চেয়ে আমার স্বতন্ত্র, যা দেখে আমায় পাগল ঠাওরায়!...কই,—না তো?...সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—চুলগুলিও তেমনিই কোঁকড়া কোঁকড়া র'য়েছে,—বুকটাও তো আগের মতোই বেশ চওড়া!......উঃ, এই বুকের মধ্যেই ছিল একটা প্রকাণ্ড জাতির

বিরুদ্ধ-অভিযানের অপ্রমেয় শক্তি অপ্রতিহত সাহস,—আর তার নীচের ?—না থাক্, যা বলছিলাম তাই বলি।—

আমার এই সাহস আর শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকে বলতো বাপ মার দেওয়া মুক্তি নামটা সার্থক হয়েছে!......অই দেখ—আবার ভুলে যাচ্ছি—কি বলতে কি বলছি!.....হাঁ, আয়নায় নিজের চেহারা অনেকক্ষণ ধরেই তো দেখলাম কিন্তু তফাৎটা যে কি তা তো কিছুই টের পেলাম না! সবই তো সেই আছে—এমন কি নাকের পাশে সেই কালো তিলটি পর্যান্ত তেমনিই র'য়েছে—তবে—তবে ?—সেই আমি, অথচ আজ আমার এমন কি নেই যার জন্যে আজ আমি জগতের কাছে হাস্যাস্পদ,—ব্যঙ্গের পাত্র,—করুণার সামগ্রী!...

...কেন—কেন, কেন এমন হলো ?—কেউ কি বলতে পারে না আজ আমি কিসের অভাবে এমন রিক্ত ?......

আমার একটা দোষ—হাঁ গো হাঁ,—মহৎ দোষ; এখন বেশ বুঝতে পারি—অস্বীকার তা কেন করবো ?—আমি সত্যই বলছি আমার একটা মহৎ দোষ,—কি দোষ ?—বলছি।—দোষ, মনের কথা মুখ ফুটে কোনও দিন বলতে পারতাম না। এই কথাটা যখন ভাবি তখন মনে হয় ঐ এক চিন্তা ছাড়া দুনিয়ায় আমার কেউ নেই,—মনে হয় আমি যেন চিন্তা সমুদ্রে একেবারে লীন হ'য়ে গিয়েছি!......হঠাৎ যখন জ্ঞান হয় মনে হয় যেন ঘুম ভেঙে গেলো—জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখি চোখের জলে বুকের জামা ভিজে গেছে—হো-হো ক'রে হেসে উঠি, মনে মনে বলি—এদের কথা বুঝি সত্যই ফল্‌লো!

*

* *

বৈঠকে ঠিক হ'লো আসন্ন আয়োজনের খরচ আমাকেই যোগাড় করতে হবে—তা যেমন ক'রেই হোক ; বাকী সকলে অন্য দিকের কাজ নিয়ে সমিতি চালাবেন। কিন্তু কেমন ক'রে সে টাকা সংগ্রহ করা যাবে এই কথাটা সকলেই এক এক বার উচ্চারণ ক'রে, আবার ভাবতে সুরু করলেন, শেষে সাব্যস্ত হলো আনন্দ রায়ের বাড়ী ডাকাতি বা ঐ রকম একটা কিছু করা ছাড়া অন্য কোন রকমেই এর মীমাংসা হ'তে পারে না। সতীশ বললেন,— আগে খোঁজ নাও কখন খাজনা আদায়ের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগে তাদের কাছে থাকে আর কোথায় কি ভাবে থাকে।

...আরও কয়েকটা পরামর্শ করার পর সেই দিনই রওনা হলাম। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি না হলেও পথ বেশ অন্ধকার, সঙ্গী সাথী কেউ নেই —সম্বল মাত্র একটি লাঠি আর একটি টর্চ।

গাঁয়ের পথ—যেমন উঁচু নীচু—তেমনি জঙ্গলে ঢাকা। কিছু দূর চলার পর নজরে পড়লো অনেক—অনেক আগে মিট্ মিট্ ক'রে একটি আলো জ্বলছে। দেখে একটু আশার সঞ্চার হলো—লাঠির উপর ভর দিয়ে মিনিট সাত আট যেতেই বুঝতে পারলাম সেটি একটি গরুর গাড়ী। আরও নিশ্চিত হলাম গরুগুলির প্রতি গাড়োয়ানের মধুর সম্বোধন শুনে।

তাদের একটু তফাতেই দাঁড়ালাম—কোমরের কাপড় খুলে গায়ের ঘাম মুছে একটু ভদ্রস্থ হয়ে তাদের কাছে গিয়ে তাঁরা

কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করতেই গাড়ীর প্রৌঢ় ভদ্র লোকটি তাঁর পাশে রাখা কি একটা জিনিষ যেন ভাল ক'রে আয়ত্ত ক'রে তার পর কথা কইলেন। প্রথমে তো পরিচয় দিতেই চান না—শেষে একটু আলাপ হ'তে বুঝলাম তিনিই গোবিন্দপুরের আনন্দ-রায় আর তাঁর সঙ্গের তরুণীটি তাঁরই এক দূর সম্পর্কের শ্যালী কন্যা। পরে জানলাম নিঃসহায় অবস্থায় তিনি তাকে নিজের কন্যার মতোই ছোট বেলা থেকে মানুষ করেছেন, তা ছাড়া সেই নাকি তাঁর এই প্রৌঢ় জীবনের এক মাত্র পুত্র ও কন্যা দুইই—সর্ব্ব প্রকারেই এখন তাঁর ডান হাত!

প্রথমে ডাকাতের কেউ হবো ভেবে পাশের রাখা পিস্তল সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন কিন্তু পরিচয় হতেই তিনি একেবারে তাঁর গাড়ীতে স্থান দিলেন। আমি যে গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, তে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কেন যে ডাক্তারী প্রভৃতির জন্য আর কয়েকটি বৎসর চেষ্টা চরিত্র করলাম না এবং এই গোলামীর পরিবর্ত্তে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী শিক্ষকতার জন্য লালায়িত তা তাঁর মনকে একদিকে যেমন দোলা দিতে লাগলো অপর দিকে মান-যশ আর প্রভূত অর্থের কথা চিন্তা ক'রে আজকালকার ছেলেদের এই অপরিণাম-দর্শিতার পরিচয় পেয়ে ক্ষুণ্ণও হ'লেন।

এমনি আলাপ-আলোচনায় যখন আমরা প্রথম জঙ্গলটা পার হ'য়ে আর একটা জঙ্গল ভরা রাস্তা দিয়ে চলছিলাম তখন হঠাৎ শান্ত আনন্দ রায়কে কেমন যেন চঞ্চল হ'তে দেখে তাঁর দিকে চাইতেই

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্‌লেন—আমরা যে জায়গায় এসেছি, —জানো বাবা, এটার নাম কাঁটাপুকুরের পাড়। নাম শুনেই বুঝতে পারছো............

তাঁর কথা শেষ হ'তে না হতেই হঠাৎ রব উঠ্‌লো,—হা—র‍্যা—র‍্যা...! তার পরক্ষণেই চক্ষের নিমিষে পাঁচ ছয় জন ভীষণকায় ডাকাত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়োয়ানের মাথা ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌লো! আমি ছিলাম গাড়োয়ানের পিছনে আর ছইয়ের মুখে, আমার লাঠি ছিলো অদ্ধেক গাড়ীর ভিতর আর অদ্ধেক বাহিরে;—অবশ্য টেনে আমি সেটা বার করতে পারতাম কিন্তু ক্ষণেকের জন্যে আমি যেন হতভম্বের মতো হ'য়ে গেলাম। আমার চৈতন্য তখন হলো যখন ভিতর থেকে কার আকর্ষণ আমাকে টান দিলে—আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে চাইতেই দেখি—সেই তরুণী। কিন্তু ভাব্‌বার অবসর পেলাম না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছইয়ে ওপর সজোরে একটি লাঠির আঘাতে সারা ছইটাকে কাঁপিয়ে তুল্‌লো। তখন বুঝতে পারলাম শুধু লাঠির আঘাতটা কাটাবার জন্যেই এই আকর্ষণ!—হঠাৎ আমার যেন মোহ ভাঙলো, চট্‌ করে ছইয়ের বাইরে মাথা বের ক'রে হাতের টর্চটা ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লাম,—আলো দেখান!—তার পরক্ষণেই সেই পড়া লাঠি ধরেই এক হেঁচ্‌কা টান দিতেই তার লাঠি আমার হাতে—তখন আর আমার পায় কে?......

চার জনকে কাৎ করে শেষেরটিকে আক্রমণ করবার জন্যে যেমন মাটিতে লাফ দিয়েছি, ছইয়ের পিছনে যে একটা লোক

অবসরের আশায় লুকিয়ে ছিলো আমি তা লক্ষ্যও করিনি—মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লাঠিও আমার মাথায় পড়লো। চোখে অন্ধকার দেখলাম—জ্ঞান হারিয়ে যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম তখন শুধু একটি অস্পষ্ট আওয়াজ আমার কানে গেল—গুড়ুম্!...

= দুই =

এক এক সময় ভাবি সেই লুপ্ত জ্ঞান যদি আর ফিরে না আসতো তা হ'লে এই যে একটা সম্পূর্ণ নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আজ আমাকে দশের চক্ষে—সমাজের চক্ষে—এমন কি জগতের চক্ষে এমন ভাবে হাস্যাস্পদ তো হ'তো হতে না;—তা হ'লে আজ এই নিজের কথা কালির আঁচড়ে প্রকাশ ক'রে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন তো হতো না!............

এক একটি ক'রে সেই সব ঘটনাগুলি চোখের সামনে যখন ভেসে ওঠে তখন ভয়ে শিউরে উঠি—দুচোখ জলে ভরে আসে। মনে হয়, কোন পাপে,—কার অভিশাপের রুদ্র মূর্ত্তি আমাদের উদ্দেশ্য—আমাদের লক্ষ্য—আমাদের অভিযানকে এমন ক'রে নিষ্ঠুর ভাবে দু'পায়ে দলে-পিষে মাড়িয়ে লুপ্ত করলে?—এমন ভাবে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে যদি আমাদের এক এক জনের জেল, ফাঁসী—দ্বীপান্তরও হ'তো তা হ'লে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হ'তো না।...........
আমরা যে মৃত্যু-জয়ী সেনা, মৃত্যু যে আমাদের পায়ের ভৃত্য.......
কিন্তু—কিন্তু, এভাবে এমন ক'রে যে বিধাতা আমাদের কপালে কলঙ্কের ডালি তুলে দেবেন তা' যে কল্পনাতেও আনতে পারি নে।

তাই ভাবি সেই এক ঘা লাঠির সঙ্গে সঙ্গেই যদি সব শেষ হ'তো তা হ'লে আজ এই বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরির জ্বালা ব'য়ে বেড়াতে তো হ'তো না!............ওগো না—না, তোমরা জাননা, কতো—কতো খানি জ্বালা—কতো তার দহনীয় শক্তি—কতো ভীষণ মধুর জ্বালা বুকে নিয়ে আজ আমি জড়পিণ্ডের মতো পড়ে আছি!—শুনলে তোমরা ভয়ে আৎকে উঠবে;—আনন্দে অবিশ্বাস ভ'রে মাথা নাড়বে!.........থাক, যা বলছিলাম তাই বলি।

ডাকাতের ঘটনার পর থেকে আনন্দ বাবুর কাছে আমি বাড়ীর অন্য সকলের চাইতে যেন বেশী আপনার হ'য়ে উঠলাম। যতো দিন বিছানায় প'ড়ে ছিলাম ততদিন আমার সেবার ভার সম্পূর্ণ মায়াই নিয়েছিলো।......... ...প্রথম যেদিন চোখ মেলে চাইলাম—দেখি আনন্দ বাবুর চেয়ার ঘিরে চার পাচটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে;—সকলেই দৃষ্টি আমার মুখের পরে—কি চোখ ঝলসানো তাদের রূপের দীপ্তি! ক্লান্ত চোখ ছটো যেন সে রূপে আহত হ'য়ে উঠলো, শ্রান্ত ভাবে তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাথার কাছে যে হাওয়া করছিলো তার প্রতি চাইতেই চিনতে পারলাম গাড়ীর সেই তরুণী। লজ্জা, কুণ্ঠা আর আগ্রহে সে মুখের সৌন্দর্য্য যেন আরও ফুটে উঠেছে। তার সেই শান্ত-স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল-শ্যামশ্রী হতে কেমন একটা লাবণ্যের উচ্ছল-ছল-ভাব,—কেমন একটা নম্রতা অথচ দীপ্তি সেই কালো মুখের চোখ দুটিতে কৃতজ্ঞতা ও উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলেছে!—মনো হলো যেন কোন সাহারার

অভিশপ্ত

পথচারী পথিক ঘুরতে ঘুরতে শ্যামা ধরণীর শান্ত স্নিগ্ধ কোমল কোলে হঠাৎ আশ্রয় পেলে—মন প্রাণ ভরে উঠ্‌লো, অবসন্ন হয়ে চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে রইলাম,— আমার বুকের কোন অজানা স্থান হ'তে কে যেন ব'লে উঠ্‌লো—আঃ!—

দেখতে দেখতে ভালোও হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু মন কেন আমার এমন হ'য়ে পড়লো?......

তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সঙ্গের তিন চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দূরে খেলা করছে। আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে ফটকের ধারে আস্‌তে একটা খোঁড়া ভিক্ষুক আমার সামনে এসে করুণ স্বরে যখন তার আবেদন জানালে তখন আমার যেন মোহ ভাঙ্‌লো। মালী এসে ভিক্ষুককে তাড়া করতেই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে চল্‌লো, কিছু দূর গিয়ে আমার দিকে ফিরে চেয়ে একটি ছোট কাগজের টুকরো পথের পাশে ফেলে দিয়ে বল্‌লে,—বাবু, আপনারা রাজা মানুষ,—তাই ব'লে কি গরীবদের পানে ফিরে চাইতেও নেই;......—এ অক্ষমরা যে আপনাদের মুখ চেয়ে আছে বাবু!......

সমস্ত চিন্তা ঘুলিয়ে গেলো—অন্যের অলক্ষ্যে কাগজের টুকরাটি তুলে দেখি ছোট্ট একটি কথা—আর কত দেরী—অচল!—ভাবলাম, —সবাই তো অচল কিন্তু আমারই কি সচল?—কিন্তু আমার কথা যে কেউ বুঝবেও না আর তা' বলবারও যে নয়!

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে বুড়ী পিসীকে চিঠি লিখলাম,—চাকরী হ'য়েছে—এ'দেরই বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পড়াবার।

টাকার জন্য পিসীমা এখন কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে বড়বাবুকে বলবার মতো সুযোগ আর সুবিধা দুই-ই ক'রে উঠতে পারিনি। ভালো আছি। ইতি তোমার —সু—।

পিসীমাকে লিখলেও এ পত্র পড়াবার জন্যে তাঁকে যেতে হ'বে সুবোধের কাছে; সে এ চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে জমিদারীর টাকা—যার জন্যে এখানে আসা তা পেতে এখনও মাস খানেক দেরী আছে আর তা হাত করবার সমস্ত ফন্দীফিকির যে আমার তৈরী তাও বুঝতে পারবে।—যাক্—

প্রভা, বিভা বড়বাবুর মেয়ে—ছোটবাবু সবেমাত্র বি-এ পাশ করেছেন এখনও তাঁর বিবাহ হয় নাই।—এঁরা কয়টী আমার মতো গরীবকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।—শুধু প্রভা আর বিভা পড়বার সময়টুকু যা আসেন আর সেই সময় প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য সময় বড় একটা কথা বলেন না।—এঁরা কথা না কইলেও আমার বিশেষ লাভ বই ক্ষতি হয়নি;—আজ আমি অকপটে স্বীকার করছি, হে দীনদুনিয়ার মালিক, তুমি আমায় গরীব ক'রেছিলে বলেই তো আজ আমার এতো সুখ, এতো সার্থকতা!

সকলের সঙ্গে যা দু'একটা কথা হ'তো মায়ার সঙ্গে একদম হতোই না।—যে দিন থেকে আমার সেবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে সেই দিন থেকে তার কথাও যেন জন্মের মতো বন্ধ হ'য়ে গেছে, আমাকে যেন চেনেই না এমন! একটা নিস্পৃহ উদাস ভাব তার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে খেলে বেড়াতো আমি বেশ স্পষ্ট অনুভব করতাম! হাজার ইচ্ছা—শত আগ্রহ বুকে ক'রে আমিও দূরে

দূরে থাক্‌তাম,...মনে মনে বলতাম,—"আমি মুক্তিসেনা, না—না, এ শুধু কৃতজ্ঞতা, এ শুধু তাঁর প্রাণপাত সেবা করার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবারই আগ্রহ মাত্র !"......

হঠাৎ দেখি মায়া সে দিন পড়তে আসেন নি। কেনো যে আসেন নি শুধু এই কথাটি যতোবারই এঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছি ততোবারই কি একটা দুর্ব্বলতা যে আমায় পেয়ে বসেছে যার জন্যে শুধানো আর হ'য়ে ওঠে না !...অকারণে—আমার অজ্ঞাতসারে কান মাথা গরম হ'য়ে উঠে।......

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়বাবুর ছোট ছেলে বিনয় বল্‌লে,—"মাষ্টার-মশায় একটু জল খাবো"। প্রত্যহ এই সময় আমার ঘরে জল খাওয়া তার চাই-ই চাই। আর এই নিষ্পল ছেলেটি যেমন আমার প্রিয় তেমনি আমার ভক্ত। আমাব ঘরে তাকে যেতে দেখে চাকরকে বললাম—"তিনকড়ি, তুমি যাও খোকাবাবুকে আমি নিয়ে আসছি।" এই কথাটুকু সেই নির্ব্বোধ চাকরের কাছে শুধু বলেছি তাতেই আমার কপালে ঘামের রেখা ফুটে উঠ্‌লো ! যে কথাটি সকালে অতোজনের মাঝে জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌তে পারিনি,—সেই কথাটি জান্‌বার ইচ্ছা,...........আমার কর্ত্তব্য,...........শুধু কৃতজ্ঞতা,—আমরা যে মায়ের দাস ;........কোনো কামনা, কোনো বাসনা আমাদের থাক্‌তে নেই—থাক্‌বার জো নেই, আছে শুধু একমাত্র কর্ত্তব্য !—সেই কর্ত্তব্যের আহ্বানে সোজা বুক ফুলিয়ে চ'লে যেতে হ'বে। পিছনে যারা প'ড়ে রইলো তারা পড়ে থাক্‌বে,—

তাদের ডাক যদি টানে,—তাদের চোখের জল যদি ব্যথিত করে,—তাদের নীরব আর্ত্তনাদে যদি বুক শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে যায় তবু,—তবু, তবু সোজা চল্‌তে হ'বে—আমরা যে মায়ের দাস—মুক্তিসেনা !...

মূর্খ চাষার সামনে থেকে নিজের অপরাধী কলঙ্কিত মুখখানা কোনোও মতে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি বইয়ের পাতায় গভীরভাবে মনোযোগ দিলাম—যেন কালই আমার পরীক্ষা !

আমাকে বই পড়তে দেখে বিনয় বললে—"বাঃ সুজিতদা, আপনি নিজেই পড়তে বসলেন আমাদের পড়াতে যাবেন না ?" তার এই সামান্য প্রশ্নটুকুতে আমি অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম, যদিও এই আট বছরের শিশু তা বুঝতে পারলে না তবু আমি কিন্তু এতটুকু হ'য়ে পড়লাম ;—যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছি খোদ মালিকের কাছেই ! বললাম,—"ছটা বাজুক, তুমি বোসো বিনু !"

"সাড়ে ছটা বেজে গেছে এতোক্ষণ,—দেখছেন না কতো অন্ধকার হ'য়ে গেছে !"

......কি মুস্কিল !......আমার ম'তো বাকপটু,—সপ্রতিভ যার জুড়ী মেলা সারা কলেজে ভার ছিলো,—সে শক্তি আমার আজ কোথায় ?—ছোট্ট একটি শিশুর কথায় অপ্রতিভ হ'তে হচ্ছে ! ....আরে মূর্খ, এটা তোর ভাবা উচিত ছিলো দুর্বলতাটা বাইরে থেকে এসে মানুষকে নীচু করে না—তার স্থান ভেতরে আছে এবং থাকবেই। যারা এমনি তোদের মতো অপরের দোহাই দিয়ে নিজেকে অপমান করে সেই খোলস যখন সত্যের আঘাতে ধূলিসাৎ

হয় তখনও তোরা দোহাইয়ের অজুহাত দিয়ে নিজেকে খাড়া রাখবার ব্যর্থ চেষ্টাই করিস কিন্তু অন্তর্যামী সে অপমান সইবেন কেনো ?...

বিনয় আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে কাছে এসে বললে,—"রাগ করলেন সুজিতদা ?"

তাকে কোলের কাছে নিয়ে হাত দুটি ধ'রে বললাম,—"না বিনু, রাগ করবো কেনো,—মাথাটা বড্ড ধরেছিলো কিনা তাই চুপ করেছিলাম। চলো তোমাদের পড়িয়ে আসি।"

পড়াতে যাবার কথা বললাম বটে কিন্তু ওঠবার লক্ষণ দুজনের মধ্যে কারুরই প্রকাশ পেলো না। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কাটিয়ে দিলাম, হঠাৎ আমার হাত ছড়িয়ে বিনয় বলে উঠলো—"অই যাঃ সুজিতদা, এবেলা মায়াদির কাছে যাওয়া হলো না তো, তিনি হয়তো দুঃখু করবেন!" তার পরক্ষণেই অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বললে—"সুজিতদা বিমল বোধ হয় বাঁচবে না!"

আচমকা আমার খোলা পিঠের 'পরে সপাং করে কে যেন চাবুক বসিয়ে দিলে,—চমকে উঠে তাকে আরোও কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম—"তার কি হয়েছে বিনু ?"

—"বিনু দাদা ও বিনু দাদা, শিগ্গীর এসো বাবু কোলকাতা থেকে এসেছেন!" এই বলে ডাক্তে ডাক্তে তিনকড়ি আস্তেই বিনয় তার সঙ্গে চ'লে গেলো—আমি বজ্রাহতের মতো ব'সে রইলাম।......

= তিন =

মাথায় আঘাত পাবার পর থেকে আর কোনো বিষয়ে আগের মতো গভীরভাবে মন দিয়ে চিন্তা করতে পারি না,—কি জানি কেন সামান্য চিন্তা করার পরই মাথা ঘুরে উঠে, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে! ডাক্তারে বেশী চিন্তা করতে মানা করলেও আমার বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি করতো না কিন্তু আমার নিজেরই আর তেমন ভালো লাগে না,—এমন কি বেশী কথা কইতেও বিরক্ত লাগে!... শুধু মনে হয়, নির্জ্জনে গিয়ে চুপ্‌চাপ্ প'ড়ে থাকি,—কিন্তু সমিতির কথা, শৃঙ্খলিত দেশবাসীর কথা—অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুর জলন্ত ছবি আমার সমস্ত সঙ্কল্প ছাপিয়ে উঠে।—টাকা চাই, অস্ত্র চাই, আর চাই ঘুমন্ত জাতির জাগরণ!...

—হঠাৎ সংবাদ পেলাম—পুলিসের বড়কর্ত্তাকে রাজপথের 'পরেই কে বা কাহারা নৃশংশভাবে হত্যা করে গেছে। সহরময় হৈ—হৈ, রৈ—রৈ প'ড়ে গেছে,—ধরপাকড় খানাতল্লাসী মহামারীর মতো সারা সহরের বুকে এমন কি আশে পাশের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে প'ড়ে সকলকেই ভীত ত্রস্ত ক'রে তুলেছে! এতো ক'রেও আসল আসামীর খোঁজ নাকি পাওয়া যাচ্ছে না শুধু কতকগুলি নিরীহ

ভালো মানুষদের ধরে তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি প'ড়ে গেছে !—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই গোবেচারা ভালোমানুষের দল কি খেয়ালে মেতে উঠলো, সমস্ত অত্যাচার সমস্ত লাঞ্ছনা তারা হাসিমুখে সহ্য করতে লাগলো,—ফাঁসী, দ্বীপান্তরও তাদের এতটুকু টলাতে পারলো না ! মা, বাপ, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত টান সমস্ত সম্বন্ধ যা কিছু ব্যথা বেদনা, আকর্ষণ বিকর্ষণ সমস্ত তুচ্ছ হ'য়ে উঠলো !—একি যাদুর মায়া না সোণার কাঠির পরশ ?—শুনে এতো দুঃখেও হাসি এলো, মনে মনে বললাম,—"পায়ের নীচের মাটিটাই যদি শক্ত না হয় তাহ'লে কোথায় দাঁড়াবে—কোথায় সাজাবে তোমার ফুলের বাগান আর কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে আরাধ্য দেবতার মন্দির ?—প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার কীর্ত্তি, তোমার সাধনার সাথে সাথে তোমাকেও যে অতলে তলিয়ে নেবে। এই জ্ঞান মানুষের যখন সত্যসত্যিই আসে যে, সে স্বাধীন নয় সে পরাধীন তখন তার বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রের সেবা করার খেয়াল একমাত্র পাগ্‌লামী ছাড়া আর কি হতে পারে ; যে শরীর মন নিয়ে বাপ মায়ের সেবা করতে যাবে—সেই শরীরটাই যে অন্যের কাছে বাঁধা—এতো বড়ো কঠোর সত্যটা লোকে ভুলে থাকে বলেই না লাঞ্ছনারও অন্ত থাকে না ;—তাই সেই সত্যের আভাষ যখন সত্যে-মিথ্যায়, নিদ্রায় জাগ্রতে মানুষ টের পায় তখন তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে মানুষ মরিয়া হ'য়ে উঠে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য কোন কষ্টই বরণ করতে পিছিয়ে দাঁড়ায় না বরং এগিয়েই চলে !—তাই তো বল্‌ছিলাম, নিরীহ ভালোমানুষের দলও যেন ক্ষেপে

উঠেছে—রাজার সমস্ত কঠোর আঘাতই তারা সহ্য করবে কিন্তু তাদের পায়ের তলায় আর মাথা পাতবে না!...........তাতে অত্যাচারের সীমাও যেমন ছাপিয়ে উঠতে লাগলো তেমনি শাসন শৃঙ্খলও ক্ষয়ের দিকেই এগিয়ে চ'ললো!...

—এটা যে ঘটবে তা আমরা শেষ বৈঠকেই তো শেষ ক'রে এসেছি! আজকে এ সমস্ত কথা কাগজের বুকে ঢেলে দেবার কি প্রয়োজন ছিলো?—হ্যাঁ, ছিলো বই কি! আজ আমি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি,—ওগো, তোমরা কেউ বুঝবে কিনা জানিনা কিন্তু প্রতিদিন পুড়ে পুড়ে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি তোমাদের কোটি কোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্য নেই তা দেবার,—অথচ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমাকে যা' দিতে হ'য়েছে বাইরের লোকে তার কতটুকই বা জানে? তবুও আমার কলঙ্কের কথা আমায় ব্যক্ত করতে হবে, তা না হ'লে দেশের বুকে যে অবস্থায় বিদ্রোহের দাবানল আমি জ্বেলেছিলাম তা না হবে পূর্ণ না হবে সার্থক!...

পিসীমার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, দুদিন পরে ফিরেছি। বাড়ীতে ঢুকতেই দেখি কেমন একটা অসম্ভব গাম্ভীর্যে সারা বাড়ীটাই থম্‌-থম্ করছে,........মনটা দ'মে গেলো, নানা রকম চিন্তা করতে করতে নিজের ঘরে হাতের কাগজ জড়ানো কাপড়টা রেখে, কাপড় জামা ছেড়ে বাগানে গেলাম।...... মাথাটা ধরেছে বলে মনে হলো,—একটু ঠাণ্ডায় স্থির হ'য়ে বিশ্রাম করলে ছাড়তে পারে—এই আশায় পুকুরের ধারে গিয়ে হাজির হলাম।

সেটা কি তিথি ছিলো মনে নেই,—কিন্তু সেটা যে শুক্লপক্ষ

তা বেশ মনে আছে। ঘসা চাঁদটী তখনও গাছগুলির ফাঁকে যেন কুয়াসা ঢাকা ওড়নার তলে লজ্জাবতী প্রিয়তমার মুখটী হঠাৎ দেখে ফেলবার আশায় উঁকি দিচ্ছিলো। মনের আনন্দ-হাসির-ঝলক্ আশে পাশে আলো-ছায়ার বিচিত্র আল্‌পনা ফুটে উঠেছে আর শীতাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতি যেন নিজের রূপে নিজেই কুণ্ঠিতা—লজ্জিতা হয়ে উঠেছে—তাই সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই চতুর্দ্দিকে এতো মৌনতা ভ'রে গেছে!—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা মন ভরে উঠ্‌লো কিন্তু হৃদয় দিয়ে যেন সে আনন্দ নিতে পারলাম না—কি জানি যেন সমস্তই প্রাণহীন অসাড় বলে মনে হ'তে লাগলো! জ্যোৎস্নাধৌত নির্ম্মল হাসির নীচে একটা যে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা লুকানো র'য়েছে তা বেশ স্পষ্ট অনুভব করলাম, অনুভব করলাম বিজয়ী লঙ্কেশ্বরের দাসত্ব-স্বর্ণ-শৃঙ্খলের অসহ্য যন্ত্রণাই ঐ হাসি হ'য়ে ঝরে পড়ছে!—শাসকের নির্ম্মম শাসন—শত জ্বালা শত ব্যথা বুকে নিয়েও তাঁকে হাস্‌তে হচ্ছে,—অপরাধ বিজিত বলে!......

এমনি সব চিন্তা এসে ভারাক্রান্ত মনকে আরও ভারী ক'রে তুললো,—কতো কাজ বাকী তার আর ইয়ত্তা নেই! যদিও সমিতির কাজ এগিয়েই চ'লেছে কিন্তু আসল উদ্দেশ্যই যে বাকী!—টাকা চাই, লোক চাই আর চাই ঘুমন্ত জাতির জাগরণ, যাতে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তনকে বিশালে পরিণত করতে পারি! তা না হ'লে একটা দারোগা মেরে, দুটো পুলিস পিটিয়ে আমাদের তো লাভ নেই!—তাই বলছিলাম টাকা—টাকা, টাকা চাই সবার আগে!......

হায় রে দর্পী মানুষ, মনের ধারা কখন যে কোন দিকে বয় তাই জানো না আর তার 'পরেই তুলতে চাও কেল্লার সুদৃঢ় অস্ত্রাগার! সে যে কোন সময়ে তোমার অলক্ষ্যেই ফল্গুর গুপ্ত ধারার মতোই ধীরে ধীরে আত্মসাৎ ক'রে নিজেকে জাহির করবে তখন কোথায় থাকবে তোমার অস্ত্রাগার আর কোথায় থাকবে বিপক্ষের প্রাণঘাতী মারণবাণ?......তাই ভাবি, মানুষের মন নিয়ে অহঙ্কারের তো খুবই ঘটা চলে কিন্তু কিসে যে তার সৃষ্টি, কিসে যে তার স্থিতি আর কিসে যে তার লয় এটার হদিস জেনে নিয়ে কয়জনে কাজ করে? উপরন্তু সেই মনকে নিয়েই ত দেখি আকাশ জোড়া গর্ব্ব!......আজ অমুক যে মন নিয়ে নারী বিদ্বেষী, কাল সেই মন নিয়েই সে নারীকে সাথী ব'লে প্রচার করছে; আজ অমুক যে মন নিয়ে নাস্তিক, কাল সন্ধ্যায় দেখি সে সেই মন নিয়েই পথের একটা নুড়ী কুড়িয়ে তারই মাথায় ফুল বেল-পাতা চাপিয়ে দস্তুরমতো আস্তিক!—এ জগতে বিচিত্র ব'লে যদি কিছু থাকে তা হ'লে আমার মনে হয় সেটা মানুষের মন...... আর এটা যে নিজের জীবন দিয়ে দেখেছি বলেই বলতে পারছি।......যাক,—

আচমকা একটা অস্ফুট ধ্বনি আমার কানে আসতেই সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো! সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি সেই হিমে ঠাণ্ডায় চাতালের 'পরে লুটিয়ে প'ড়ে কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আস্তে আস্তে কাছে যেতেই বুঝলাম, মায়া;— তার এক রাশ চুল ধুলায় লুটোলুটি খাচ্ছে—কান্নায় শরীর ফুলে ফুলে

উঠছে। হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে গেলাম, মাথার মধ্যে বেশ একটা বেদনা অনুভব করলাম, কিন্তু আমার শিক্ষা আমার দীক্ষা তারস্বরে যেন চীৎকার করে বলে উঠলো—"মুক্তি সেনার কর্ত্তব্য ছাড়া আর তার নিজের বলে কিছু থাক্‌তে নেই,—থাক্‌তে পারে না!"......একবার মনে হলো,—হয়তো বা আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি;—হয়তো কেন নিশ্চয়ই! এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়ায় সারা দেহ বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করলেও মনের মধ্যে স্বস্তি কেন ফিরে পাই না?.....যেন সে বল্‌তে থাকে—"আঃ, যদি সত্য হতো?" কিন্তু একি, আমি কি সত্যি সেই আমি?...... আমি না মায়ের দাস;—একটা শক্তিমান শাসক জাতির মূর্ত্তিমান বিদ্রোহী,—আমার মুখের পানে চেয়ে আছে কোটি কোটি শৃঙ্খলিত নিষ্পেষিত দেশবাসী!......ওঃ, মাথা ঘুরে উঠ্‌লো। কে যেন বাইরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বলে উঠ্‌লো—"চলে যাও—সরে যাও," চল্‌বার জন্যে পাও তুললাম কিন্তু চল্‌বার শক্তি পাই না কেনো?—ফের বুকের অন্তরতম স্থান থেকে কে যেন বলে উঠ্‌লো "এই যে নব জীবন তুমি পেয়েছ যার অক্লান্ত পরিশ্রম আর অনাবিল স্নেহ সেবায়, তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতাও তোমার থাকা উচিত!......ওগো, এ যে আর্ত্ত, আর্ত্তকে শুধু সান্ত্বনা দেওয়া,—না-না, আর কিছু নেই, থাকতেও পারে না!"......

সামনের গাছ থেকে কি একটা ঝটপট্‌ ক'রে উড়ে যেতেই আমার চমক্‌ ভাঙ্‌লো;—চেয়ে দেখি সত্যই মায়া। দ্বিধা সঙ্কোচ সমস্ত ভুলে গেলাম, সসম্ভ্রমে কাছে গিয়ে ডাকলাম,—"মায়া!"......

ডাক শুনে সে মাথা তুললে, নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বল্‌লে, "সুজিত বাবু, বিমল আমার নেই……" বল্‌তে বল্‌তে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, সম্বিৎ হারিয়ে সে পড়ে যায় দেখে ধরে ফেললাম।……হ্যাঁ গো হ্যাঁ, একেবারে আমার এই সবল বাহু দুটিতে।……ওগো, ন্যায় বিচারক যদি কেউ থাকো, এই টুকু ক'রো যেন কোন লজ্জা, কোন ভয়ে ভীত না হয়ে আমি আমার সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করতে পারি,…তার পর, যে শাস্তি দেবে তাই, তাই আমি বুক পেতে নেবো ; আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি—সব কিছু নাও, শুধু এই করো যেন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার সকল কথাকে সহজ করে প্রকাশ করবার শক্তিটুকু হরণ করো না!—জানি, আমার পাপের হয়তো অন্ত নেই, ইহকালের আশাও গেছে পরকালের ভরসাও রাখি না, কিন্তু তার জন্যে কি দায়ী আমি?……উঃ, যখন তার এলায়িত তনু আমার এই বুকের 'পরে তখন আমার মতো নৃশংসেরও সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। তার এলোমেলো চুলের গোছা মুখের চারি পাশে সরিয়ে দিলাম—বুকের অন্তস্থলে কি এক ব্যাকুল বাসনা দুলে দুলে উঠতে লাগলো।……চকিতে নিজেকে সামলে নিয়ে তার দেহটি মাটিতে শুইয়ে রেখে নিজের কোঁচা ভিজিয়ে জল আনলাম। লুণ্ঠিত মাথাটি অতি স্নেহে পরম যত্নে নিজের কোলের 'পরে তুলে একটু একটু ক'রে জল দিতে দিতে ডাকলাম,—"মায়া—মায়া!"…

—"অ্যাঁ!" বলে ধীরে ধীরে চাইলো, তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লাম ;—"মায়া, কেমন আছো?"

আমার মুখের পানে অর্থ হীনের মতো চেয়ে এই কথাটি শুনে হঠাৎ সে ধড়মড় ক'রে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে, বেশ শান্ত সংযত স্বরে বল্‌লে,—"সুজিত বাবু, আজ বিমলকে জন্মের মতো বিদায় দিয়েছি, আপনি এখানে ছিলেন না জানতাম তাই একটু নির্জ্জনে এসে বসেছিলাম—কিছু মনে করবেন না।" বলে সহজ সরল ভাবে পা ফেলে বাড়ীর দিকে চ'লে গেলো আর আমি বাজপড়া তাল গা[illegible] র [illegible]তো স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।......

= চার =

যতোই দিন যেতে লাগলো আমার ধারণা শক্তি ধীরে ধীরে ক'মে আসতে লাগলো, তার ফলে আমার কথার সংখ্যাও হ্রাস হ'তে হ'তে ক্রমে লুপ্ত হবার উপক্রম হলো। বিনয়ের ছোট ছোট সাথীগুলি আর তেমন ক'রে না মিশলেও বিনয় কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হাল ছাড়েনি। সে আগের মতোই আসে, আবদার করে, আপন মনেই অনর্গল ব'কে যায়, আবার দুএকটা কথার মনোমতো উত্তর পেলে উৎসাহিত হ'য়ে উঠে। এক এক সময় একেবারেই আক্রমণ ক'রে বলে বসে—"সুজিতদা, কথা কইছেন না কেনো,—অসুখ করেছে !"

আমার এই মৌনতাকে সকলেই ধরে নিয়েছে মাথার অসুখ কিন্তু প্রভা যেন কেমন সন্দেহ করে। আমার ও মায়ার মাঝে এই নীরব উদাসীনতার নীচের একটা যে বেশ গোপন টান আছে—সবার পিছনে ঐ কালো—হ্যাগো হ্যা, আমি নিজের কানে শুনেছি তাকে কালো বলে ঠাট্টা করতে, আনন্দবাবু আদর দিয়ে যাকে মাথায় তুলেছেন, সেই মায়ার প্রতি আমার যেন একটা আকর্ষণ আছে এই সংশয় দূর করবার জন্যে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করতো।

এমনি সব চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, বিছানার 'পরে অসময়েই নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। সে সময় আমার অজ্ঞাতসারে সারা বুকটাকে দুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে,......মনে হয়, যেন যুগযুগান্তের রণক্লান্ত সৈনিক আমি,—একটু জল, একটু ছায়া,......আর যে পারি না গো;......জল জল, একটু জল চাই!

হঠাৎ যেন চমক্ ভাঙে,—সোজা উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকি,—না, কাজ—কাজ, কাজই জীবনের একমাত্র ব্রত—সব-সব, সব মিথ্যা—প্রলোভন—মরীচিকা!......ভাব্‌তে ভাব্‌তে শরীর গরম হ'য়ে ওঠে, অত্যাচারীর নিষ্ঠুরতা স্মরণ ক'রে হাত আপনি মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে পড়ে—পা ঘন ঘন চল্‌তে থাকে।

দ্বিগুণ উৎসাহ বুকে নিয়ে কাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি—দশপনেরো ক্রোশ দূরে দূরে এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমাদের সমিতির বৈঠক বসে।—ফলে অত্যাচারী শাসকের রক্তে আমাদের হাত রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে!—মাত্র কয়েকটা ভারতবাসী আমরা যে রক্ত-স্রোত বহালাম সারা সহর গ্রাম ভয়ে বিস্ময়ে কাঁটা হ'য়ে উঠলো। আমার জেলায় যদি কারুর রক্তের প্রয়োজন হতো তা হ'লে তার আঘাত আসতো ঠিক বিপরীত দিক থেকে, অথচ আমি থাকতাম নিষ্ক্রিয়। এমন এক একটি সাক্ষী আমার থাকতো যার জন্যে আমার কেশ স্পর্শ করা তাদের অসাধ্য হ'য়ে উঠতো। আবার আমায় যখন এই কাজে নামতে হতো তখন আমি আমার গোড়া পত্তন এমন করে রাখতাম যার ফল আরও আশ্চর্য্য।—

পথের নেশা

আমার ঘরটি জমীদার বাড়ীর সুউচ্চ প্রাচীরের ভিতর বাগান সংলগ্ন। প্রয়োজনের সময় ঠিক সকাল থেকে আমার মাথার অসুখ বৃদ্ধি পেতো। সারাটা দিন মায়ার আর প্রভার তত্ত্বাবধানে কেটে যেতো। রাত্রে নটা সাড়ে নটার সময় মায়া প্রভাকে কিম্বা দাসীকে সঙ্গে করে আসে, ঔষধটা মাথায় মালিস করে যাতে রাত্রে না জেগে কাটাই তার জন্য বার বার জানিয়ে যখন চলে যায়—আমি অবসন্নের মতো চৌকির ওপর পড়ে পড়ে বোধ করি বা গোনা কড়িকাঠ-গুলিই গণনা করবার চেষ্টা করতাম।...........কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝতে পারি তখন মনের অবস্থা যা হতো, কেউ যদি বিচার ক'রে দেখতো তা' হ'লে স্পষ্ট বুঝতে পারতো,—মন আমার তিক্ত বিরক্তে ভরে উঠেছে; যতোই এগিয়ে চলেছি ততোই দেহ-মন-প্রাণ অবশ হ'য়ে আসছে!...কোথায় কে যেন ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট ক'রে ব'লে ওঠে —"ভুল — ভুল!"—জানি না এ ভুলের অন্ত আছে কি নেই, আর যদি থাকে—যদি থাকে ই তা হ'লে এ ভুলের পরিসমাপ্তিই বা কেমন ক'রে ঘটবে! এতো উদ্যম—এতো উৎসাহ—এতো প্রেরণা বুকে নিয়ে প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে যে চ'লেছি যখন ঐ ভ্রান্তি ভাঙবে তখন কি ফের চলবার সামর্থ্য থাকবে,—না চলতে পারবো? ....আবার সেই ভুল যখন ভুলেই লয় হবে, ওগো ন্যায় অন্যায়ের মালিক, তখন, তখন কি মনস্তাপের অবধি পাবো!......কিন্তু,—তবু চ'লতে হবে,—উপায় নেই! দেশ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে,—অত্যাচারীর নিষ্পেষিত—লাঞ্ছিত আত্মা আমার চারিপাশে হাহাকার করছে—যেতে হবে, উপায় নেই, না না, উপায় নেই!......

এমনি ছোট বড়ো লহরের পর লহরে দোল খেতে খেতে জীবন আমার চলেছে তো চলেইছে।......

পিসীমার অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় আমার এক দূর সম্পর্কের মাসীমাকে আনবার জন্য পত্র পেলাম। সেই দিন বৈকালেই রওনা হ'য়ে পড়লাম এই ভেবে যে, কাল মাসীমাকে বাড়ীতে দিয়ে সন্ধ্যায় কিম্বা পরের দিন সকালে এখানে ফিরতে পারবো।

সকালে মাসীমাকে ঠিক্-ঠাক্ হ'য়ে থাক্‌তে ব'লে গেলাম রায়েদের বাড়ী মুরলীর সঙ্গে দেখা করতে। ছেলেবেলার বন্ধু—বহুদিন হলো তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। গেলোবার বি-এ, পাস ক'রে এখন স্থানীয় স্কুলে সে মাষ্টারী করছে। সংসারে মা আর বিধবা বৌদি ছাড়া আর তার কেউ নাই,—তবে মাস কয়েক হলো তার বিয়ে হয়েছে,—অবশ্য আমি আসতে পারিনি, শুনেছিলাম।

গিয়ে শুনলাম, সে বাজারে হেডমাষ্টারের বাড়ী গেছে বিশেষ একটা কাজে আর মা, বৌদি গঙ্গা স্নানে গেছেন এই এলেন বলে!—আমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে এই শুভ সংবাদ দিয়ে তাদের বুড়ো চাকরটি গরুর সেবায় মন দিলো।

আমি কি আর করি, টেবিলে রাখা বইগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।—হঠাৎ একখানি বইয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়লো একটি রেজেষ্টারী খাম আর একটি বড়ো হাতের লেখা কতকগুলি কাগজের এক তাড়া। ভাবলাম, হয়তো পরীক্ষার কোশ্চেন-পেপার হবে, কিন্তু হাতের লেখাটা যখন ভালো করে চোখে পড়লো তখন চম্‌কে উঠলাম;—এ যে আমাদের নির্ম্মলের হাতের লেখা!......

কখন যে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়তে সুরু করে দিয়েছি তার আরখেয়ালই ছিলো না!......

কোলকাতায় এক কলেজের একই শ্রেণীতে যখন নির্ম্মল আর মুরলী পড়তো তখন থেকেই তাদের পরিচয় ছিলো, তারপর একই মেসে সমানে কয়েকটি বৎসর মেলামেশায় আর উভয়ে উভয়ের দেশের বাড়ীতে আসা-যাওয়া থাকায় বেশ একটা আত্মীয়তা জন্মেছিলো। সেবার মুরলী যখন ভীষণভাবে বসন্তে আক্রান্ত হ'লো, মেসের অধিকাংশ সঙ্গীসাথীরা স'রে দাঁড়ালো, পচাগলা মুরলীকে নিয়ে যখন যমে-মানুষের টানাটানি অবস্থা তখন যে লোকটি তার মস্ত প্রাণ আর ততোধিক বড়ো সাহস নিয়ে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত্রির সেবায় তাকে আরোগ্য করে তুললে—সে তার প্রিয়তম বন্ধু নির্ম্মল! এই ঘটনার পর থেকে তারা দুইজনে যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়লো। নির্ম্মলের মনটা ছিলো ফুলের মতো নরম, শিশুর মতো চঞ্চল, নদীর মতো উদ্দাম, কাঁচের মতো ঠুন্‌কো, কিন্তু মুরলী ঠিক তার বিপরীত স্বভাবের—ধীর, স্থির, সংযত। এদের বিরুদ্ধ হৃদয় দুটি যেন কোন অদৃশ্য হাতের স্পর্শ-ইঙ্গিতে মনের মিল সব সময় না হ'লেও প্রাণে-প্রাণে তারা এক হ'য়ে গেলো!—সামান্য সামান্য কারণে কেমন ক'রে যে লোকে ভুল করে, আর সেই ভুলের ফলে কতো অমূল্য প্রাণ যে অকালেই নষ্ট হয়, সে জ্ঞান সেই দিন হলো যে দিন নির্ম্মলের চিঠি পড়লাম!.........সব কথা ভালো মনে নেই, তবু যতোটা মনে আছে, তাই লিখছি,—এতে আর কিছু না হোক একটা আঁচ দেওয়া তো হবে তা হলেই যথেষ্ট!—

"যাক্, যা বলছিলাম তাই বলি—আর কখনও বলতে যাবো না। ......গতো জীবনের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত পাপ—যা কিছু মন্দ আমার সাথে সাথে বিদায় নিক আর তোমার সামনে থাক শুদ্ধ-নির্ম্মল-পবিত্র-উজ্জ্বল স্বপ্নভরা জীবন !......

"আজ মনে পড়ছে,—গতো জীবনের প্রত্যেক কথাটি থেকে সুরু ক'রে সেদিনকার শেষ কথাটি পর্য্যন্ত, কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, আমাদের কলেজ জীবন আরম্ভ হবার সময় থেকে আমরা ছুটিতে মিলেছিলাম আর তা শেষ ক'রে সংসারে নাম্‌তে না নাম্‌তেই তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লাম,—ভালই হলো, সমস্ত অপরিণত বয়স্কের খেয়াল ব'লে বেমালুম পিছনের দিকে ঠেলে রাখা যাবে—কি বলো ?

"এক একবার মনে হয়,—মানুষ নিজের জীবন দিয়ে কি করে অভিনয় করে ? তা না হ'লে, তোমাদের বাড়ীতে কতবারই তো গিয়েছি, তখন বেশ অনুভব করতাম আমার প্রতি সকলেরই একটা আন্তরিকতার যেন অন্ত নেই !—সবই সত্যি, কিন্তু আজ ?.........

"অপরের নীরব উপেক্ষা কখন কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে আসে আর তা সমস্ত যুক্তিতর্কের জটিল শাস্ত্রের গণ্ডী এড়িয়ে অপরকে আঘাত করে সে শুধু অন্তর্য্যামী ছাড়া মানব বুদ্ধির একেবারেই অগোচর এই অভিজ্ঞতা সেই দিন লাভ করবে যেদিন সত্য সত্যই কাউকে ভাল বাসবে—হৃদয় দিয়ে ভালো বাসবে—তার আগে নয়। এ আঘাত শুধু অনুভব করা ছাড়া সম্পূর্ণ অব্যক্ত, বুঝিবা ব্যক্ত করাই যায় না, ব্যক্ত করতে যাওয়াটাই হয় শুধু বিড়ম্বনা।

"বৌদি তোমাদের মাঝে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যখন ডেকে বল্লেন—"এসো ঠাকুরপো, একটু আলাপ করবে এসো!" তাঁর সে ডাকে যে কতোখানি ব্যথা ঝরে পড়ছিলো তা শুধু আমিই জানি, মনে হ'লো এই একটা স্নেহময়ী মূর্ত্তির কাছে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সত্যিকারের স্নেহ ভালবাসা যে অন্তর্যামী তা বৌদিকে দেখে সেদিন নূতন করে জানলাম। আমি যে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে বাইরেই কাটাই, আগের মত আর তেমন ভাবে মিশিনা, সারাদিন টো টো করে বিনা কাজেই ঘুরে বেড়াই এটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। অশ্রু চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো,—হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাত দুটো জোড় ক'রে বললাম, "ক্ষমা কর বৌদি, এ বিড়ম্বনার ভার আর যে কেউই আমার ঘাড়ে চাপায় চাপাক কিন্তু তুমি চাপিও না, জিজ্ঞাসা করলে বলো পরেশ এসে ধরে নিয়ে গেছে কংগ্রেস মিটিংএ গান গাইবার জন্যে।" বলে তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম। বৌদির গলা দরজার কাছ থেকেও শুনতে পেলাম—"শোনো ঠাকুরপো, শুনে যাও লক্ষ্মীটি!"......

"ভাগ্যে সেদিন আনন্দের আতিশয্যে যাইনি—তাহ'লে আজ আমার লজ্জা রাখবার এতটুকুও ঠাঁই থাকতো না; নিজের মান বাঁচিয়ে মাথা সোজা ক'রে ফিরে আসা আমার অসম্ভব হ'য়ে উঠতো। নিরন্তর এই কথাটি আমায় ঘুরে ফিরে আঘাত দিয়েছে যে, যার জোরে জোর যার সম্বন্ধে সম্বন্ধ সে নিজেই যখন নির্লিপ্ত তখন গায়ে পড়ে অধিকার আদায় করতে যাওয়া প্রীতিকর ত নয়-ই বরং অপমানকর। এই কয়দিন যার পীড়নে তোমাদের বাড়ীতে

খাওয়া আমার মোটেই সম্ভব হয়নি—যখনই খেতে বসেছি শুধু মনে হয়েছে এ সমস্ত কিছুই যেন দয়ায় ভরা,—যা কিছু মুখে দিয়েছি সমস্ত গলায় জমা হ'য়ে উঠেছে, করুণার দান হাতে করে নিতে সর্ব্বশরীর আমার সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছে!

"পড়তে পড়তে এসমস্তের একটা সন্তোষজনক উত্তর যে তোমার মুখে জমা হ'য়ে উঠেছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু একটা কথা তোমাকে এর উত্তরে জানাচ্ছি,—সংসারে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা তর্কের মুখে সমস্ত তুচ্ছ—ভূয়ো বলে উড়িয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কিন্তু যদি অন্তর দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করা যায়,—অনুভব করা যায় তা' হ'লে চুপ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থাই নেই—তারপরও যদি স্বীকৃত না হয় তাহ'লে হয় তিনি মস্ত বড়ো হমবগ নয় তিনি অনেক "পোড়" খেয়েছেন, এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা।—একজন যেন জাগবোনা বলে প্রতিজ্ঞা করে ঘুমানর ভান করেন আর একজন যেন ঘুমানর ছলে জেগে থাকেন।

"অনেক কথা মনে পড়ছে আর অপমানের ভারে মাথা নুয়ে পড়ছে।...না—না, কোন বাঁধন নেই,...কোন সম্বন্ধ রাখবো না—যাতে তোমাদের ওখানকার মাটিতে পা দেবার মত সম্বন্ধ না থাকে তার চেষ্টা করবো—এই সঙ্কল্প কেমন করে কাজে পরিণত করতে পারি তারই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলাম, কিন্তু তাতেও বাধা দিলে এক বিধবার অশ্রু।...

"যে ব্যথা, যে বেদনা সেদিন আমার বুকে বেজেছিল মনে হয় আমার মানুষকরা মা মারা গেলে বুঝি এতো বড়ো আঘাত আমি

পাইনি।—এরই ভারে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের ঘরে লুটিয়ে প'ড়ে যখন কাঁদছিলাম—বললে কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানিনা কিন্তু আজ আমি সত্য সত্যই বলছি বড় কান্নাই সেদিন কেঁদেছিলাম। —যখন এ চিঠি তোমার হাতে পড়বে তখন এর লেখক তোমার সম্পূর্ণ আড়ালেই চ'লে যাবে, তারপর এমন একদিন আসবে যখন আমার সত্যিকারের খবর পাবে তখন হয়তো একটু ব্যথা বাজবে, তোমার অজ্ঞাতে তোমার মাথা নুয়ে আসবে—হয়তো বা পরিণাম চিন্তা করে আতঙ্কে শিউরেও উঠবে—কিন্তু তখন আমি তোমার সকল আয়ত্তের বাইরে চলে যাবো;—শত চেষ্টা শত কৌশল করলেও আমার নাগাল পাওয়া ব্যর্থ-ই হবে।...যে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত বহ্নি আমি জ্বালবো—যুবা বৃদ্ধ এমনকি শিশুও ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে এক অপূর্ব্ব আবেশে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে।...আজ আমি কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি, হে জন্মমৃত্যুর কর্ত্তা, আমি যেন ফের এই দেশের মাটিতেই ফিরে আসি, আর যে আঘাত আমি পেয়েছি এর শতগুণ বেশী আঘাত পেয়ে যেন ফের মর্ত্তে পারি!...আজ আর কোন কথা লুকাবো না, সত্য কথা যা তাই বলে যাই,—সেই নিশুতি রাত্রে বিয়ে বাড়ীর আনন্দ কোলাহল যখন থেমে গেছে তখন হঠাৎ মনে হলো একটি স্নেহময় কোলে আমার লোটান মাথাটি কে ধীরে ধীরে তুলে নিলে। চেয়ে দেখি বিধাতার অভিশপ্তা—করুণার পাত্রী মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনা—বৌদি।...চমকে উঠলাম তখন, যখন দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার কপাল চুম্বন করলো। স্নেহভরা কণ্ঠে বৌদি ডাকলেন—"ভাই!" উঃ, সে ডাক এখনও যেন আমার কানে

বাজছে,...আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না,—অসহ্য যাতনায় অব্যক্ত স্বরে বলে উঠলাম—ওগো ন্যায় অন্যায়ের বিচারক, আর, আর সইতে পারছি না—আর বাঁধন দিও না।......

"কতক্ষণ যে দুটি প্রাণীতে নিস্তব্ধে কাটিয়েছিলাম তা নিজেই যে ভালো করে জানিনা প্রকাশ করবো কেমন করে। সমস্ত সঙ্কল্প আমার ভেসে গেল,—কে যেন আমার কানে কানে বলে দিলে,—আরে মূর্খ, ঝোঁকের মাথায় যা করতে চাইছিলি সমস্ত সম্বন্ধ মুছে ফেলে গণ্ডি টানবার ব্যবস্থা করছিস্ একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ দেখি, তোর ব্যথা, তোর বেদনা এদের এই আনন্দের মাঝে প্রকাশ পেলে সেই স্মৃতিটাই যে কাটিয়ে উঠা এদের ভার হবে। তখন ভাবলাম—সত্যইতো, এই দাগটাই তো এদের এই একান্ত আনন্দকে চিরদিন মলিন করে রাখবে,—না না, এদের আনন্দ আনন্দ হয়েই থাক, আমার যা তা আমারই থাক্!

"মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বৌদি বললেন,—"ঠাকুরপো, সত্যিই আর আসবে না? যদি কখনও আস ভাই তোমার বৌদির কোল তোমায় নেবার জন্যে সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকবে জেনো।" উত্তরে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম, "আশীর্ব্বাদ করো বৌদি আর যেন আসতে না হয়।"—জান ভাই, মানুষ যখন সত্যি সত্যিই বিশ্বাস হারায় তখন তার পরমাত্মীয়দের ওপরেও আস্থা হারিয়ে বসে। অনেক ব্যথাই দিয়েছি—কিন্তু আমি যা পেয়েছি তা কাউকে বলবার নয়—বুঝি তার সীমা পরিসীমাও নেই!

"তাঁর কোলের'পরে মাথা রেখে এক সময় বলেছিলাম,—"বৌদি

আমি যদি সত্যই তোমাদের কেউ হতাম, তাহ'লে এ উপেক্ষা নিশ্চয়ই আমাকে পেতে হতো না।—আচ্ছা বৌদি, জন্মের সম্বন্ধটাই কি সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ—প্রাণের মূল্য কি কিছুই নেই?"......

"উত্তরে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আবার আমার কপাল চুম্বন করলো—মুখে তিনি কিছুই বললেন না।—তা না বলুন, কিন্তু সেই দু'ফোঁটা চোখের জলেই আমার সকল সন্দেহের ইতি হলো। সত্যি-কারের বাঁধন যেখানে নেই সেখানে প্রাণের কোন মূল্য আছে কি নেই এ সমস্যার সমাধান যদি এতো সহজেই হতো তা হ'লে যুগযুগ ধরে যে এতো মধু, এতো কাব্য, এতো ব্যথা জাতির গৌরব বৃদ্ধি ক'রে আসছে, সে যে অঙ্কুরেই ধ্বংস পেতো—মাথা তোলবার তার আর অবসরই হ'তো না যে!......

"চলে আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করবো না ঠিক ক'রে ছিলাম,—আর সত্যি বল্‌তে কি অতো ভোরে তোমার ঘুম ভাঙান-টাই উচিত বলে মনে করিনি কিন্তু মুস্কিল বাধলো আমার সুটকেসটা তোমার ঘরে থাকায়। হাত মুখ ধোওয়ার পরে দেখি বৌদি সেটা নিয়ে এলেন আর তার পরক্ষণে তুমিও নেমে এলে। তখন একটু ক্ষীণ আশা জাগলো যে, আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাবে আর এই বিদায়ের ক্ষণে অন্ততঃ মন খুলে দুটো কথাও বলবে। ছিঃ ছিঃ, এই মনের জন্যে আজ আমার নিজের'পরে ধিক্কারের আর অবধি নেই,—ঠিক শাস্তিই হ'য়েছে!...এবেলার পরিবর্ত্তে বিকালে খাওয়া দাওয়া করে যাওয়ার মত কি একটা বললে—আমি যেন শুনতেই পাইনি এমনি ভাবে সেটাকে এড়িয়ে গেলাম।...এই প্রথম আমি একলা তোমার

বাড়ী থেকে ষ্টেশনে এসেছি, আবার সেই প্রশ্ন জাগলো—সত্যি-কারের বাঁধন যেখানে নেই সেখানে মান আর অভিমানের মূল্য কতটুকুই বা ?...অথচ এরই একদিন...যাক...

"আসবার সময় সকলের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তাঁদের চোখের সামনে থেকে আমার চোখের জল রুদ্ধ করে মান বাঁচিয়ে আস্‌তে পেরেছি তার জন্য ভগবানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক্‌বো। এরই ভয়ে বৌদির মুখের পানে ভাল করে চাইতে পর্য্যন্ত সাহস করিনি—অথচ বাগানের মধ্যে যখন ঢুকলাম তখন পোড়া চোখের জল আর বাধা মানল না !...

"অযথা ক্ষেতের ধারে ব'সে ব'সে কেন যে সময় কাটালাম তা বল্‌তে পারি না,—শেষে একটা মুটের ডাকে চমকে উঠে তার মাথায় সুটকেশটা চাপিয়ে যখন ষ্টেশনে গেলাম তখন কলকাতার গাড়ী চ'লে গেছে। আর একটা আছে তা প্রায় সাড়ে বারটা কি একটায়। মনটা বড়ই দ'মে গেল। ষ্টেশনের সেই চায়ের আলাপী ভদ্রলোকটী বল্‌লেন,—"এতো দেরী করলেন যে!—ঘণ্টাখানেক আগে এলে গাড়ীখানা পেতেন।" একে মনের অবস্থা এই, শরীরও ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম, এই কয়দিন না হয়েছে সময় মত স্নান না হ'য়েছে সময়ে খাওয়া, দেহের আর দোষ কি। আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে তিনি আমার মুখপানে চেয়ে বললেন—"ব্যাপার কি, এতো শুক্‌নো লাগছে কেন অসুখ টসুখ করেছিল নাকি ?"—বিয়ে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের যা হয়ে থাকে প্রভৃতি উদাহরণ দিয়ে বললাম—"এই দেখুন না, আসবো তা না খাইয়ে ছাড়লেন না, এতো সকালেই কি

খাওয়া যায়, না,—তৃপ্তি হয়? দিন এক কাপ চা!—আর এই দেখুন না, খাওয়ার জন্যই শুধু গাড়ীটা ফেল হলো!"......এমনি সত্য মিথ্যা যা মুখে এলো বলে, এক কাপ চা খেয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম;—শরীর মন যেন একান্তে একটু বিশ্রাম চাইছিল—অথচ এমন স্থানে শোওয়াও যায় না।—যদি কোন পরিচিতের সামনে পড়ি তা হ'লে সকলেই সন্দেহ করবে যে, গাড়ী যখন ফেল হ'লো তখন বাড়ী গিয়ে নাওয়া খাওয়া না করে কেন এখানে শুয়েছিলাম,—আর বাড়ীও বিশেষ দূরে নয় যখন!

"অবসাদে যখন শরীর মন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে উঠেছে তখন কি করি, কোথায় যাই,—কিছুই ঠিক করতে পারলাম না; অন্যমনস্কের মতো চল্‌তে চল্‌তে গিয়ে পড়লাম প্লাটফর্মের অনতিদূরে পাম্পিং মেশিনের চালক পরিবারের কোয়াটারের ধারে। যায়গাটী যেমন নিরিবিলি তেমনি ছায়াবহুল, একটু তৃপ্তিবোধ করলাম।

"গাছতলায় একটি উল্কি পরা স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে বললাম—"বুড়ীমা, আমার শরীর ভালো নেই—মাথাটা ভয়ানক ঘুরছে তা তোমাদের ঐ খাটিয়াটি যদি ঘণ্টাখানেকের জন্যে দাও আমি তোমাদের পান খেতে কিছু পয়সা দেবো।"

"কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কোলের ছোট ছেলেটিকে নিয়ে আমার একেবারে প্রায় সামনে এসে বললে "বাবা, এরকম পয়সার অন্ন আমায় যেন খেতে না হয়—এই আশীর্ব্বাদ করো। ছেলে আমার যা রোজগার করে তাতে আমাদের বেশ চলে যায়। তোমরা ভদ্রলোক, একটু বসবে তাতে আবার পয়সা!...বলতে বলতে

আমাকে অবাক করে সে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে একটি ময়লা ওয়াড় পরানো কাঁথা কিম্বা লেপ আর একটি তদুপযুক্ত বালিস এনে গাছতলায় খাটিয়াটা পেতে পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিয়ে যখন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,— "বোস বাবা, বোস, ওটা ঐখানেই থাক কেউ নেবেনা।" তখন আমি তার দিকে তাকাতে পারলাম না—মনে হ'লো বালিভরা হাওয়ার ঝাপ্টায় দুচোখ যেন কর্ কর্ কর্ছে! তার ব্যস্ত আর সযত্নে বিছানা পাতা দেখে মনে হলো—একটীমাত্র ছেলে বহু দূরের সহর থেকে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলে মায়ের যেটুকু ব্যস্ত-ব্যাকুল হওয়া উচিত এ তাই, এর মধ্যে এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই, আতিশয্যের নাম গন্ধও নেই।......

"সুটকেশটা পাশে রেখে বিছানায় শুতেই কেমন একটা উগ্র গন্ধে পেটের সমস্ত নাড়ীগুলো যেন পাক দিয়ে উঠল,—আমার মধ্যে আজন্মের যে বিলাসী বাবুটি এতক্ষণ মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে ছিল, হঠাৎ সে যেন আকাশ পাতাল চীৎকার করে উঠতে চাইলো কিন্তু সারা দেহটা ঠিক পক্ষাঘাতের মতোই অসাড় হ'য়ে পড়ে রইলো—না পারলাম একটু নড়তে না পারলাম পাশ ফিরতে। এই কথাই শুধু হ'তে লাগলো,—এতদিন যত বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি এইবার এইখানেই বুঝি তার পরিসমাপ্তি—এই তার শেষ সীমা।......

"কোলকাতায় যাবো শুনে সে বললে,—"তুমি বাবা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোও, গাড়ীর সময় হ'লে আমি ডেকে দেবো" বলে চলে গেলো। আমি চাদরটা আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে প্রায় তিন চার ঘণ্টা

পড়ে রইলাম;—মনের মধ্যে কতো কথাই আসা যাওয়া করতে লাগলো—একদিন, এ দেশের প্রত্যেক ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত আমার আগমনে কতো প্রীতি সম্ভাষণই না ব্যক্ত করতো—আর আজ ?......

"এমনি মন নিয়ে আমার অবস্থাটা যে কি এবং কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিচার করবার মতো শক্তিও ছিল না সামর্থ্যও ছিল না। তা নইলে, আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না যে, এক নোংরা জাতির ততোধিক নোংরা দুর্গন্ধভরা বিছানায় আমি সজ্ঞানে শুয়েছি। একথা আজও মনে হ'লে আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন কেন্নো কিল্ বিলিয়ে নড়ে বেড়ায়।—কিন্তু এতোতেও আমার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হ'লো না—বোঝা বেড়েই গেলো।......যে তীব্র জ্বালা সমস্ত শক্তি দিয়ে সহ্য করবার আশায়—ভোলবার আশায় আমি এতোদূর নেমে-ছিলাম—সে জ্বালা আরোও উজ্জ্বল আরোও তীব্র হ'য়ে উঠলো পল্লীগ্রামের একটা অস্পৃশ্যা অশিক্ষিতা উল্কিপরা স্ত্রীলোকের ব্যবহারে;—জানিনা এমনি ধারা অশিক্ষিতা বাঙলাদেশের পল্লীর ঘরে ঘরে আছে কি না,—যদি থাকে, তাহ'লে সেটা সে দেশের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তারও বিচার ক'রতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই আমার মতো উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালীদের নিয়ে তাদের সংসারে চলা যে শুধু বিড়ম্বনা তা নয়,—মর্ম্মন্তুদও বটে!......আমার মতো ভাগ্য হয়তো সকলের জোটে না, হয়তো জোটে কিন্তু এটাও ঠিক যে আমারি মতো তারা বিচার করে দগ্ধ হয় আবার দগ্ধায়ও; তাই আজ মনে হচ্ছে এই ভাগ্য পাওয়াটাই বড়ো নয়, বড়ো সেইটাকে মানিয়ে তার তালে পা ফেলে চলতে জানাটা।......চ'লে আসবার সময়

কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ একটী পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললাম—"বুড়ী মা, তোর নাতিকে খাবার কিনে দিস্।"

"নোটখানি নেবার সময় তার দীপ্ত মুখটী মুহূর্ত্তে মলিন হ'য়ে গেলো। আমার মুখের পানে কী একভাবে চেয়ে থেকে বললে,—"আমরা জাতে হাড়ি, আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা ছায়া মাড়ালে নাইতে হয় তাও জানি; কিন্তু লোকে এ কথা ভুলে গেলেও আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারিনা বাবা, যে, আমিও মানুষ—আমিও মা।".........

"এলোমেলো পা ফেলে ষ্টেশনের দিকে চল্‌তে চল্‌তে দীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের পানে চেয়ে বার বার বল্‌তে লাগলাম,—"না, আর না, বৎসরের পর বৎসর ধরে যে গ্লানি আকণ্ঠ ভরে উঠেছে—এথেকে মুক্ত হ'তে হবে। এ অন্ধকূপ থেকে পরিত্রাণ না পেলে ইহকাল পরকাল কিছুই নেই,—না আমার না জাতির।"

চিঠি পড়তে পড়তে চোখের সামনে সমস্ত ঝাপসা হ'য়ে উঠলো! —আমি ভাবতাম, বুঝি আমারই দুঃখের পারাবার নেই,—বুঝি শুধু আমিই অনন্ত শূন্যে স্থানভ্রষ্ট গ্রহের মতো আগুনের বোঝা বুকে ক'রে যুগ-যুগান্তর ধ'রে কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি!......

এটা কেউ ভাবে না যে, নিজের মনের খবরটাই যার অজানা সে অন্যের মনের খবর কেমন ক'রে পাবে?—নিজের মন দিয়ে যারা পরের মনের বিচার করে তারা যে শুধু ভুল করে তা নয়

নিজের দুঃখের বোঝা আরো ভারী করে বসে। আরে, তোমার একটী মনের একটী ধারার সঠিক খবর জানোনা আর এই বিশ্ব জগতের লক্ষ-কোটী নরনারীর লক্ষ-কোটী মনের শতসহস্র কোটী ধারার খবর রাখবে কেমন কোরে?—তাই তো দেখি, প্রতি পদে পদে ঠকার সংখ্যা যেমন বাড়ে—তেমনি জড়িয়ে পড়তেও হয়। এখন ভাবি, নিজের দুঃখের তুলাদণ্ডে যারা পরের দুঃখকে যাচাই করতে যায় আমার মতো চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত তাদেরই করতে হয়।

হঠাৎ মুরলীর গলার আওয়াজ পেয়ে চম্‌কে উঠে নিজের মুখ খানাকে বেশ পরিষ্কার করে—জলের চিহ্ন মুছে ফেলে সোজা হ'য়ে ব'সেছি, এমন সময় সে আবার ডাকলো "মা!" যেমন করুণ তেমনি বুকফাটা তার ডাক; আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সিঁড়ির ওপর রোয়াকের ধারে অবসন্ন ভাবে ব'সে পড়েছে, পাশে কয়েকটী বই আর একটী খবরের কাগজ পড়ে রয়েচে, কাছে গিয়ে ডাক্‌লাম—"মুরলি!"

ধীরে ধীরে মুখ তুলে আমার পানে চেয়ে হাতের মধ্যে মুখ-লুকিয়ে নিতান্ত ছেলে মানুষের মতোই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পাশে বস্‌তে গিয়ে কাগজটার বড় বড় অক্ষরে নজর পড়তেই অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

পুলিশের নজর এড়িয়ে আমাদের সমিতি যেতে পারেনি, তারা তাদের বড় কর্ত্তার হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে যখন গভীর রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ-সৈন্য নিয়ে বাড়ী ঘেরাও করে, তখন নির্ম্মল

পালাবার উপায় না পেয়ে সমস্ত কাগজ পত্রে এমনকি কিছু কিছু আসবাবপত্রেও পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর বারান্দায় এ'সে উপর্য্যুপরি গুলি ছুড়ে বিপক্ষের কয়েকটিকে হত ও আহত করে,—অবশেষে যখন দেখলে নীচের দরজা ভেঙ্গে তারা ঢুকে পড়েচে তখন নিজের গুলিতে নিজেকেও শেষ করে।

এতে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়নি বটে কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার পর তৈলহীন প্রদীপ-শিখার মতই তার পূর্ণ জ্ঞান হয়, সেই সময় সে স্বীকার করে—"আমার নাম নির্ম্মল রায়, পুলিশের বড়ো কর্ত্তার হত্যাকারী আমিই......অত্যাচার যখন তার সীমা ছাড়িয়ে যায় বলির প্রয়োজন তখনই হয়।"......

এটা প'ড়ে আজ আমার কি জানি কেন আগের মতো রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠলো না শুধু দেখতে দেখতে কাগজের লেখা গুলি একাকার হ'য়ে গেলো,—মন যেন কোথায় কার উদ্দেশ্যে আছাড় খেয়ে বল্‌তে লাগলো—"এর কি কোন প্রয়োজন ছিলো ?—এমন যে একটা প্রাণ অকালে ঝরে পড়লো সে কার দোষে,—ভুল কার,—এর সার্থকতাই বা কোথায় ?...ওগো অন্তর্য্যামী, এ ভুলের বিচার তুমিই কোরো আমার বলবার কিছুই নেই,—তবে এইটুকু বল্‌তে চাই এ ভুলের আগুন যদি তোমারই সৃষ্টি আর সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যারা নিজেকে আহুতি দেয় তারা তোমার পায়ে ঠাঁই পায় কিনা জানিনা, কিন্তু যারা বাইরে থেকে তার উত্তাপে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে তাদের সহ্য করবার শক্তিটুকু যেন হরণ ক'রে নিয়ো না প্রভু !"... .....

: পাঁচ =

তাদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে যখন ফিরি, মুরলী তখন বলেছিলো,—"সুজিত, বলবার আমার কিছুই নেই, আর তার জন্য অপেক্ষাও সে রাখেনি ;—আমার ঘাড়ে সে যতো দোষ চাপিয়েছে, সে সমস্তই আমার স্বীকার করা সার্থক হতো যদি বুঝতাম সে শাস্তি পেয়েছে ; কিন্তু আমার সে পথও সে রুদ্ধ করে গেছে ! আমাকে খাটো করে দেখতে গিয়ে সে নিজেই ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে—এইটাই আমাকে সব চেয়ে বেশী বিঁধছে !"

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে একটু হেসে সে বললে, "তুমি ভাবছো এসব কথা আর কেনো,—তা সত্যি, সে যে কী দুর্জ্জয় অভিমান নিয়ে জন্মেছিলো, এতটুকু আঘাতও সেখানে লাগলে যে সে সইতে পারবে না, তা আমি যতো জানি এত বোধ হয় সে নিজেও জানতো না।"—একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, "যাবার সময় যে ডালি সে আমার জন্যে রেখে গেছে, সুজিত, তা দুঃখের হোক সুখের হোক আজীবন আমি মাথায় ক'রে রাখবো,—সম্ভব হ'লে তার পরেও— !".........

রাস্তায় বেরিয়ে এই কথাটা কেবলি ঘুরে ফিরে আমায় আঘাত

দিতে লাগলো—"মুরলীটা মানুষ না পাষাণ!—বলে কি? পথ চলায় কতোখানি শক্তি পেলে মানুষ এমনি ক'রে কথা বল্‌তে পারে?... সে শক্তি কি?......কোথায় তার সীমা আর কেমন ক'রেই বা লোকে তা লাভ করে?—যে গেলো সে তো জন্মের মতোই চলে গেলো কিন্তু যে থাক্‌লো সে ক্ষতি কি দিয়ে সে পূরণ করবে!" মূরলীর সহজ সরল কথা কয়টি আমার আজন্মের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অহঙ্কার সমস্ত ওলোট পালট করে দিলে।

নির্ম্মলের চিঠি পড়তে পড়তে আমি ভেবেছিলাম—মানুষকে নূতনের মোহ যখন টান দেয় তখন পিছন ফিরে তাকাবার অবসরই দেয় না,—মূরলী নিজের বিয়ের আনন্দে হয়তো তার প্রিয়তম বন্ধুর পানে আগের মতো চাইবার অবসর পায়নি—না পাবারই কথা! কিন্তু একটা সামান্য পোষা পাখীর প্রতিও মানুষের টানের অন্ত থাকে না—তার মৃত্যুতে নাওয়া খাওয়া লোকে ভুলে যায়, আর এ তো তার বন্ধু, তার বিয়োগের সংবাদ পেয়ে প্রথমটা যেন সংস্কার বসে ছেলেমানুষের মত কেঁদেছিলো কিন্তু তার পর-ক্ষণেই উঠে আগের মতোই আমার আদর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো! আমি তাদের পরস্পরের যতোটা জানি আজ আমি জোর গলায় বলছি মূরলীর অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। কতোখানি গভীর ভালোবাসা থাকলে এহেন বন্ধু বিয়োগের দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে তারই দেওয়া মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মানুষ হাসিমুখে বহন করতে পারে! যদি তার প্রিয়তম বন্ধুর অশরীরী আত্মা এতটুকুও স্বস্তি পায় সেই টুকুরই আশায় সে দীর্ঘ

জীবনের সারা পথ চল্‌বে এই মিথ্যা বোঝা বয়ে!......ভাবতে ভাবতে মন আমার কি এক অপূর্ব্ব রসে ভরে উঠ্‌লো—শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাথা আপনি নত হ'য়ে এলো। মনে মনে বল্‌লাম,—ভগবান, কেনই বা এই চলার পথের সৃষ্টি আর কেনই বা এই বিয়োগান্ত নাটক—এরো কী প্রয়োজন ছিলো?......

পিসীমার কাছে মাসীমাকে যখন নিয়ে গেলাম তখন তাঁর অবস্থা আগের চেয়ে ভালো দেখে আশ্বস্ত হলাম। সে দিনটা সেইখানে থেকে আমাদের সমিতির কতোদূর কি জানতে গিয়ে শুনলাম বিনা অর্থে সমিতি আর চালানো দায় হয়ে উঠেছে—এক পাও আর ফেলবার সামর্থ্য নেই। নির্ম্মল ছিলো বড়োলোকের ছেলে—এতদিন সেই কোনও মতো ঠেকিয়ে রেখেছিলো কিন্তু আর চলে না। অনেকগুলি অস্ত্রও বেশ সুবিধায় পাওয়া যাচ্ছিলো এখন তাও হাত ছাড়া হবার উপক্রম হঠাৎ এমন সুযোগটা হারানো আমাদের সমিতির পক্ষে সমীচিন নয়।......

...আমাদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম,—অবশ্য টাকা থাকলে তার প্রয়োজনও ছিল না কিন্তু তা যখন সহজে পাবার উপায় নেই তখন অপর পক্ষে এই হাঙ্গামাটা একটু ঢিলা পড়বে আর আমরা টাকাটাও পাবো তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লেই হবে।—এমনি দু একটা পরামর্শ দিয়ে যখন আনন্দপুরে পৌঁছুলাম তখন বেলা পড়ে গেছে।

নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়েছি এমন সময় প্রভা বিনয়ের সঙ্গে এসে হাজির; তার এভাবে হঠাৎ আসায়

আমি বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—তা থেকে রেহাই দিলে বিনয়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে সে বললে "কখন এলেন সুজিতদা ?... ..আমাকে ডাকেননি কেনো......, জানেন সুজিত দা, আপনি না ডাক্‌লেও আমরা খবর পেয়েছি,—বড়দিই ত জানলা থেকে দেখতে পেয়ে আমায় বল্‌লে—আপনাকে চা খাবার জন্য ডেকে আন্‌তে !—চলুন সুজিতদা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর !"

ঝড়ের মতো এতোগুলি কথা সে ব'লে তো গেলো কিন্তু সে ঝড় যাদের উপর দিয়ে বয়ে গেলো তাদের অবস্থাটা যদি তার শিশু হৃদয় জানতে পারতো তা হলে তার হাসি খুসি মুখ থানি তেমনি অন্ধকারে ভরে উঠতো যেমন অন্ধকার ছেয়ে ফেলে ঘরের এক মাত্র প্রদীপটা নিভে গেলে !

প্রভার দিকে হঠাৎ চাইতেই দেখি সে লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "সুজিতবাবু, আশ্চর্য্য হবার এতে কিছুই নেই বরং যেটা স্বাভাবিক,—যেটা বাঙালীর ঘরে সচরাচর হয়ে থাকে এটা তাই ! পল্লীগ্রামে যারা বাস করে তাদের এটা মজ্জাগত দোষ সুজিত বাবু, যে, তাদের গ্রামের সামান্য একটা চাষাও যদি দেশে ফিরে আসে তা হ'লে কুশল জিজ্ঞাসা করাটা ! আর সেই একই জল-বায়ুতে মানুষ হয়ে আমি যদি আমার বাবার জীবন-রক্ষাকারীকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, তাতে আপনি আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন কি ক'রে ? আপনি আমাদের যা ক'রেছেন, তার তুলনায় আমার এটুকু তো কিছু নয় !

......কিন্তু আপনি বড়ো স্বার্থপর কেবল নিজের দিকটাই এতো বড়ো ক'রে দেখেন বলেই অপরেরও একটা দিক থাকতে পারে সেটা আর চোখেই পড়ে না।......নিন তাড়াতাড়ি আসুন, আমি দেখিগে, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে কি না!

এ অনুযোগের যে কি উত্তর হ'তে পারে আর কোথায় যে এর প্রকৃত রহস্য কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না,—শুধু অন্যমনস্কের মতো বিনয়ের আকর্ষণে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম ; মনের মধ্যে তখনও বেশ একটা দ্বন্দ-যুদ্ধ চলছিলো।

টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসতেই বিনয় আমার পাশটিতে বসে তোতাপাখীর মতো অবিরাম বকে যেতে লাগলো আর যাতে তার কথায় মন দিই তার জন্যে মাঝে মাঝে আমার হাত ধ'রে টান দিচ্ছিলো। মায়া চা খায় না—তাই এ বৈঠকে তার প্রবেশ অনধিকার। প্রভা নিজে সকলকে চা ঢেলে দিয়ে আমার সামনে বিভার পাশে ব'সলো। সামান্য দু-একটা কথার পর প্রভা বললে, "সুজিতবাবু, আপনি যে প্রবন্ধ রচনা করতে দিয়েছিলেন, আমি সে বিষয়ে অনেক ভেবে দেখলাম, কিন্তু এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না যে, আমাদের দেশের যা অবস্থা তাতে সব চেয়ে অনিষ্টকর এই গণ্ডীর পর গণ্ডীর বাঁধনটাই কিনা—আর সেইটাই ছিন্ন করা আগে উচিত কি না?—আপনিই বলুন!"

আমি বিভার দিকে চেয়ে বললাম, "বিভা, তোমার কি মত?" এর আগে আমি সকলকেই আপনি বলতাম, দিনকয় আগে বড়বাবুর তিরস্কারে সেটা বাধ্য হ'য়ে আমাকে লুপ্ত করতে হয়েছে।

বিভা কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু প্রভা বাধা দিয়ে বললে,—"উঁহু, বিভা কি করে বলবে ?"

বিস্মিত হ'য়ে তার দিকে চেয়ে বললাম,—"কেনো ?"

"কারণ বিভা তো আর মায়া নয় যে, যা বলবে তাই বেদবাক্য হ'বে !"—

বলে প্রভা ক্রুর কঠিন দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রতি চেয়ে যেন মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো।

বিভা নীলা আর লীলা প্রায় সমবয়সী, প্রভা এদের চেয়ে তিন চার বৎসরের বড়ো হবে। বিশ্ব-শিল্পীর মানস প্রতিমাকে পূর্ণ ও সার্থক করবার জন্যে যৌবন যেন তাঁর সবটুকু শ্রী সবটুকু সৌন্দর্য্য উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন ! সে বুদ্ধিমতী, বিদুষী, সুন্দরী, সেই জন্যই আমার মনে হয় তার অভিমানটা ছিলো সাধারণের চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু এটা আমি আজও ভেবে পাইনা যে, কারণে অকারণে মায়াকে উপলক্ষ্য ক'রে আমাকে আঘাত দেওয়ায় তার কি লাভ !......

এদের তুলনায় মায়ার রূপ কিছুই নয়,—কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য সুষমায় তার বাহিরের সমস্ত দীনতাকে ছেয়ে দিয়েছিলো, যে তার সংস্পর্শে আসতো সেই মুগ্ধ হতো, শ্রদ্ধায় তার মন আপনিই নত হ'য়ে পড়তো ! তার বুদ্ধি ছিলো যেমন তীক্ষ্ণ বিদ্যা ছিলো তেমনি গভীর, এই জন্যই আনন্দবাবুর সে ছিলো ডানহাত, জমীদারীর সমস্ত কিছুরই ভার সে যেমন তাঁর কাছে সহজ সহনীয় ক'রে তুলেছিলো তেমনি ক'রে তুলেছিলো তাঁর শেষ-জীবনের চলার-

পথ সুগম !......কিন্তু এটা আজও আমার কাছে জটিল হ'য়ে রইলো যে, প্রভা, যখন তখন মায়াকে উপলক্ষ্য ক'রে আমায় আঘাত দেয় কেন !...এটা আমি স্বীকার করি যে, মায়ার বিদ্যা-বুদ্ধি যে তাদের চেয়ে অনেক বেশী, কথাপ্রসঙ্গে একথাটা অনেক সময়ে বলেছি, সেই জন্যই কি এ ঈর্ষা ?...সে তার বাবার স্নেহ-পালিত—আপনার জন কেহই নয়, এটা সেও যেমন বোঝে, বাড়ীর দাসীটিও তেমনি জানে, তবু তার, 'পরে কেন এ আক্রোশ ?

আজ আমার কি জানি কেন অযথা বেশ একটু রাগ হলো, বল্লাম, "তা সত্যি" !

এই ছোট কথাটির পিছনে যে বৃহৎ উপেক্ষা প্রচ্ছন্ন ছিলো তারই আঘাতে জ্বলে উঠে প্রভা বল্‌লে, "সুজিতবাবু, আপনি ভালো বাসেন ব'লে তাকে বড়ো করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তাকে দিয়ে আমাকে অপমান করাটা কি উচিত ?" বলে ক্রোধে অপমানে চোখ-মুখ লাল ক'রে চা না খেয়েই সে উঠে পড়লো। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম তার কথা শুনে। এর আগে কেউ যদি একথা বল্‌তো—জানি না তার অবস্থাটা কি হ'তো কিন্তু আমার অক্ষমতা দেখছি দিন দিন আমাকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে চলেছো ...শুধু ভদ্র-মহিলার সম্মান,—অক্ষমতার মাত্রা আমার যেমন বাড়লো তেমনি বাড়লো কলঙ্কের বোঝা !...তার মুখ চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "প্রভা, তোমাকে অপমান করবো মনে করে আমি একথা বলিনি—বল্‌তে পারিও না ! এটা আমি জানি যে, আমি

তোমাদের এমন কেউ নই যাতে তোমাদের সমকক্ষতা প্রকাশ করবো।"

এ কথায় প্রভা চকিতে ফিরে আমার মুখের পানে চেয়ে কি যেন ভাবলে, তার পর ঝুপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লো।

এর পর এই আবহাওয়াটাকে কাটিয়ে ওঠা সকলেরই পক্ষে ভারী হ'য়ে উঠলো—চঞ্চল বিনয়ও হঠাৎ যেন গম্ভীর হ'য়ে পড়লো—কেমন একটা নিস্তব্ধতার থম্‌থমে বাতাসে ঘরটি ভরে উঠলো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো।

এই মৌনতা ভঙ্গ হলো দরোয়ান রামতেওয়ারীর মিষ্ট-মধুর আওয়াজে, চম্‌কে উঠে সকলেই কৌতূহল-উৎসুক চোখে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলো—ছোট ছেলের কান্না ভরা কাকুতি মিনতি শুনে। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে বাইরে আসতেই "মাষ্টার মশাই" বলে পটল চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

তার কাছে গিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কান্নায় সমস্ত কথাই তার অবোধ্য হয়ে উঠলো; অনেক কষ্টে রামতেওয়ারীর সাহায্যে বুঝলাম তার দাদা মারা গেছে সেই জন্যে সে আজ পড়তে আসতে পারবে না, উপরন্তু আমাকে তাদের বাড়ী তার সঙ্গেই যেতে হবে।

আনন্দবাবুর পুত্র অতুলবাবু যখন এম, এ পাশ করে দেশে ফিরে আসেন, তখন, সেই বিদ্যার সাথে সাথে অনেকগুলি বদখেয়ালও এনেছিলেন। যতো রাজ্যের চাষাভূষার ছোট ছোট ছেলেদের নিজের খরচে নিজের বাড়ীতে বিনা পয়সায় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াটাই

ছিলো নাকি তাঁর বড়ো খেয়াল, তা ছাড়া জঙ্গল কাটা—ম্যালেরিয়া তাড়ানো প্রভৃতি আনুসঙ্গিক অনেক বাতিকের চিহ্ন আজও সাক্ষ্য দেয়। পুত্রের এই সব অদ্ভুত খেয়াল আর বাতিক দেখে আনন্দবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট না হ'লেও এক মাত্র শিক্ষিত সন্তানকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে তাঁর পিতৃহৃদয় যেন ব্যথিত হ'য়ে উঠতো! তাই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেন বটে কিন্তু কাজের বেলায় তিনি যেন দেখতেই পেতেন না এমনি ভাবেই সরে যেতেন!

সেবার মাত্র দুইবার ভেদ আর বার-দুই-তিন বমির সঙ্গে সঙ্গেই অতুলবাবু মারা গেলেন, তখন সকলেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো আনন্দবাবুর জন্য। কিন্তু আনন্দবাবুকে এতটুকু চঞ্চল এতটুকু বিচলিত হ'তে আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখেনি। শুধু একবার মায়াকে বলেছিলেন, "মায়া, তুই দেখনা মা, স্কুলটাকে যদি চালাতে পারিস!"

সেই থেকে মায়ার সহায়তায় বৃদ্ধ সরকার মশায় ঝুঁকে পড়া ঘরের মত নৈশ স্কুলটিকে কোনও মতে যেন ঠেক্‌নো দিয়ে খাড়া রেখে ছিলেন,—আমি ভালো হ'য়ে উঠলে তার ভার পড়লো আমার ওপর; প্রথমে আমি বিরক্ত হ'য়েছিলাম, কিন্তু মায়ার একটি কথা শুনে আমার মন দোটানা স্রোতের মুখে প'ড়ে থমকে গেলো।

আমারই ঘরে বসে মায়া বলেছিলো—"জানেন সুজিতবাবু, যতোই লোকে "দেশ-মাতা দেশ-মাতা" করুক, আর যতোই ঢুমদাম ক'রে তা প্রচার করুক, কিছুতেই কিছু হবে না;—এ সেই দিনই

দাঁড়াতে পারবে যে দিন ঐ লাঙ্গল কাঁধে চাষাটি মাঠের দিকে চলেছে, ওরও বোঝবার শক্তি হবে যে, সে কোথায় আর কি অবস্থায় আছে !"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি দেখে বাধা দিয়ে সে বল্‌লে, "আপনি যে এর প্রতিবাদে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ দেবেন তা আমি জানি, আর এও জানি যে, সে সব কাট্‌বার মতো বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই কিন্তু যেটুকু সহজ সরল বুদ্ধিতে বোঝা যায় সেইটুকুই আমি বলেছি—বল্‌তে চাইও !...এই দেখুন না, যাঁরা পল্লীগ্রামের শিক্ষা-গণ্ডী ছাড়িয়ে সহরের বিভিন্ন ভাবের মধ্যে গিয়ে প'ড়েছেন,—বাইরের পানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার সুযোগ পেয়েছেন,—অন্যের তুলনায় নিজেদের দৈন্য যখনি তাঁদের চোখের সামনে প্রকট হ'য়ে ফুটে উঠেছে তখনই তাঁদের মনে জেগে উঠবার ক্ষীণ ইচ্ছাশক্তিও অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠেছে। আজ যদি তাঁরা প্রত্যেকেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে নিজের নিজের দেশে ফিরে যেতে পারতেন তা হ'লে পল্লীর বুকে এতো পাক জম্‌তো না !...তাঁদের সেই ইচ্ছাশক্তির অঙ্কুর এতো শিশু এতো সুকুমার যে, বেশিদিন তারা টিক্‌তে পারলো না, নানা আবহাওয়ায় নানা আওতায় তারা অকালেই শুকিয়ে গেলো—এটা যে কর্ত্তাদের প্রধান আর অব্যর্থ শিক্ষারই ফল তবু যাঁরা সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে ছিট্‌কে আসতে পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা এতো সামান্য যে কিছুই নয় বল্‌লেই হয়! তাই তো অতুলদা বলতেন, "জানলি বোন, এই ছোটলোকের ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করাটাই সবার আগে দরকার।—যেদিন জানবো,

এদের ছেলেরা নিজেদের দৈনিক, মাসিক হিসাবটা ঠিক রাখছে, দরকারের সময় আঙুলের ছাপ না দিয়ে নামটা সই করতে পারছে, অবসর মতো বুড়ো বাপ-মাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছে, পাশের গ্রামের খবরটা নিতে শিখেছে, তা ছাড়া যেটা সব চেয়ে দরকারী, তাদের দেয় টাকার রসিদটায় সাপ লেখা আছে না ব্যাঙ লেখা আছে সেটা দেখে নেবার মতো বিদ্যা জন্মেছে,—সেই দিন জানবো, কাজ আমার অনেক এগিয়েছে,—সেই দিন বুঝবো জমি তৈরী,—বীজ ছড়াতে যা দেরী!—এটা আমি ঠিক জানি সুজিতবাবু, মাটি যদি সত্যি সত্যি ভালো তৈরী থাকে, তাতে যোদ্ধাই গড়ুন আর সন্ন্যাসীই গড়ুন কিছুই বাধবে না!"......

প্রাণের সঙ্গে মায়ার কথাগুলি গ্রহণ করতে না পারলেও তবু আমায় এ কাজে নামতে হ'লো। দু-চার দিনের মধ্যে দেখি আমি এর ভেতর বেশ একটু জড়িয়েও পড়েছি,...কিন্তু আমার আজন্মের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার সমস্ত ওলোট-পালোট হ'য়ে গেলো;—সেদিনকার ঘটনায়। মূর্ত্তি ধরে মায়ার কথাটা যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, ইঁট-পাথর মেশানো মাটিতে আর যাই হ'ক মূর্ত্তি গড়া চলবে না,—গেলেও তা পাকাও হবে না সুষ্ঠুও হ'বে না!

—তাই, যখন রাম কুমোরের জোয়ান উপার্জ্জনক্ষম বড়ো ছেলেটি ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বিনা ঔষধপত্রেই মারা গেলো, তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা কেউই পাশে এসে দাঁড়ালো না, এর মূল কারণ—সে আর তার ছোট ভাই নাকি শ্যাম কুমোরের জারজ

পুত্র ;—অশাস্ত্রীয় পাপের ছাপ যে মৃত দেহের উপর এখনও জ্বল জ্বল করছে !

যখন পটলের সঙ্গে তাদের জরা-জীর্ণ খোড়ো ঘরের উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন আমার মতো নরঘাতীর বুকও হা-হা করে উঠ্‌লো !......

দুই কানের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠ্‌লো,—হায়রে মূর্খ পথভ্রান্ত, দেশ উদ্ধার করবি কাকে নিয়ে ? যাদের সমাজের অঙ্গ প'চে গ'লে অকর্মণ্য—পঙ্গু হ'য়ে রয়েছে—তারা সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে কিসের জোরে ? এমনি ধারা অন্ধ-সংস্কারের গ্লানির বোঝায় যাদের সারা দেহ দিনে দিনে নুয়ে পড়েছে—কোথায় পাবে তারা অপরের গতিরোধ করবার শক্তি ?......দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরে জমাট বাঁধা অন্ধকারে যাদের দৃষ্টি-পথ রুদ্ধ তার কেমন ক'রে পাবে পথ-চলার সন্ধান ? ওরে,...আলো চাই,—বাতাস চাই, আর চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা !......

—দেখি, সত্যর দেহটিকে শতছিন্ন মাদুরে জড়িয়ে একটা ছোট মইয়ের ওপর বেঁধে তার মা উঠানে নামাবার জন্যে দাওয়ার নীচে থেকে টানাটানি করছে।—প্রতি পলে পলে যে নিজের রক্তে পুষ্ট ক'রে দেশের মধ্যে দশের মধ্যে যাকে দাঁড় করালে আজ চরম সময়ে সেই মাকেই ছেলের শব ব'য়ে নিয়ে গিয়ে একটু একটু ক'রে পোড়াতে হ'বে নিজের হাতেই ;—এক বিন্দু চোখের জলও ফেল্‌তে পাবে না, তার কি গেলো, কতোখানি গেলো, সে যাওয়া যে কী আর তা না থাকার যে ক্ষতি, সে ক্ষতি উপলব্ধি করবার জন্যে মায়ের

দু' দণ্ড বসে কাঁদবার অবসরকেও যে সমাজে বাহুল্য ব'লে মনে করে, ভগবান, তাদের উদ্ধার কোন প্রায়শ্চিত্তে করবো!...... কবে কোথায় তার মায়ের কি একটা গলদ ছিলো, সেইটাই বড়ো হ'য়ে জেগে রইলো আর,—পুত্রকে জন্মের মতো হারিয়ে চোখের জল রুদ্ধ করে পুত্রের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে মায়ের প্রতি মুহূর্ত্তে যে কোমর নুয়ে পড়ছে—হাঁটু ভেঙে আসছে, পা টলছে—সেটা নেহাৎ-ই তুচ্ছ?......বুকের কোন অজানা স্থান থেকে কে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে বলে উঠলো,—"এই নিকষ কালো আঁধারের মধ্যে থেকে যে আলো বাতাসে তার এই বোধ-শক্তিটুকু জেগেছে—সেই জ্ঞান সেই শক্তিটাই যে চাই সবার আগে। এ ছাড়া, যদি যুগ যুগান্তর ধরে বলির উৎসব চালাস, তাতে তোদের বোঝা বেড়েই যাবে,—না হ'বে সাধনা না হ'বে সিদ্ধি,!......

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হ'য়ে উঠে,—সর্ব্ব-শরীর কী এক অসহনীয় জ্বালায় রি-রি করতে থাকে,......বুকের মধ্যে বহ্নিশিখা যেন ব্যর্থ আক্রোশে নিজের শরীরকেই শুধু ক্ষতবিক্ষত ক'রে গর্জ্জন করতে থাকে।......

......জলমগ্নের মতো প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠে,—একী রিক্ততা, ...একী ব্যর্থতা, একী সমস্যার গিরিসঙ্কট অভ্রভেদী চূড়া নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালো?......কোথায় আর কেমন ক'রেই বা পাবে এই একান্ত আর চরম বাধাকে দূর করবার অমোঘ-শক্তি-অস্ত্র!...না—না, এ কিছুই নয়, যে পথে চলেছি সেই পথই ঠিক!—বলি, বলিই এ পূজায় একমাত্র উপচার,—নির্ম্মল ঠিকই বলেছিলো—

অভিশপ্ত

"অত্যাচার যখন তার সীমা ছাড়িয়ে যায়, বলির প্রয়োজন তখনই হয়!"......

কিন্তু?—আবার কিন্তু! মন আমার এই হত্যা-উৎসবের চিন্তায় উল্লসিত হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু তাতে যেমন না পাই প্রেরণা তেমনি হ'য়ে পড়ে আন্তরিকতার একান্ত অভাব!

সন্ধ্যাবেলা যখন সত্যর দাহ কাজ সেরে ভিজা কাপড়ে অনিল আর আমি কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম, তখন এই কথাই শুধু মনে হ'তে লাগলো—এই যে গাঢ় কুয়াসার হিম-শীতল চাপে পল্লীর মাঠ-ঘাট থেকে সুরু ক'রে প্রতি ঘরটি পর্য্যন্ত প্রাণহীন, স্পন্দনহীন অসাড়—সবিতার তেজোদীপ্ত প্রতিভায় যখন এ সব উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে, সে দীপ্তি কি রক্ত-রাঙা করাল হাসিতে ভরা,—না, সোণালী শান্ত-স্নিগ্ধ-স্মিত হাস্যোজ্জ্বল?...

— ছয় —

দিনের পর দিন আমি সত্য সত্যই জড় স্তূপ হ'য়ে প'ড়ছি,—বেশী কথা কইতে যেমন বিরক্ত হই—তেমনি বিব্রত হ'য়ে পড়ি তাল বুঝে লোকের সঙ্গে কথা কইবার সময়। এমনি অবস্থায় অনিল যখন আমার একান্ত নিকটতম হ'য়ে পড়লো তখন এই ছোট লোকের ছেলেগুলির ভার তার হাতেই তুলে দিলাম। প্রথমে সে আপত্তি করেছিলো—কিন্তু যখন তাকে বুঝিয়ে বললাম,—"অনিল, আমি এখানে থাকবো ব'লে আসিনি,—যাবো বলেই এসেছি, তুমি আমাদের এ পথে পা দিতে চাইলেও আমি দিতে দেবো না;—তার চাইতে এই দিকটা ধ'রেই প'ড়ে থাকো, এর মধ্যে যে দুর্গ তুমি গড়তে পারবে, তা শত আঘাতেও চূর্ণ হবার আশঙ্কা নেই!... আমরা দুর্গ গড়েছি দেহের বাইরে—তাই ত' সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হয়ে থাক্‌তে হয়, কিন্তু তোমার গড়া দুর্গ থাক্‌বে দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায়—যার শক্তি যার তেজ হবে অজর-অমর-অক্ষয়,—শত্রুর আঘাতে যদি এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়ে ত' রক্তবীজের মতোই দেখবে শত শত রক্তবীজ একের স্থানে উঠে দাঁড়িয়েছে! তাই ত' বলছিলাম, আমাদের দুর্গ যে এই দেহের বাইরে,—যখন বিপক্ষের

আঘাতে ভাঙতে সুরু হয় তখন একেবারেই লুপ্ত হ'য়ে যায়,—এতটুকু চিহ্নও যে তার অবশিষ্ট থাকেনা ভাই!"......

এমনি একটি একটি ক'রে সব সম্বন্ধ—যা কিছু বন্ধন ছিলো একে একে ছিন্ন ক'রে বাহিরের ঘরটিই সার করলাম ;—ফলে সকলেই জেনে গেলো এবার আমার মাথা একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে!...সময় সময় নাকি ভুলও বকি,—আর তা' হ'য়ে পড়ে যেমন অসংলগ্ন তেমনি থাকে না তার সামঞ্জস্য। শুনে একটু হেসে অন্য-মনস্কের মতো কী যে এলোমেলো ভাবতে থাকি তার কোন কূল-কিনারা নিজে নিজেই খুঁজে পাই না!...ধীরে ধীরে অবসন্নের মত বিছানার' পরে শুয়ে পড়ি,—অকারণেই, আমার অজ্ঞাতসারেই, কী এক দুর্ব্বিসহ ব্যথায় বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করতে থাকে।—মনে হয়, রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ যা কিছু সারাংশ ছিলো হঠাৎ যেন কোন সাহারার পিপাসা এক নিঃশ্বাসেই শুষে নিয়েছে,—পড়ে আছে শুধু নীরস উত্তপ্ত হাহাকার ভরা হাজার হাজার বৎসরের পিপাসিত জীবনের শেষ অংশটুকু!......জল-জল, একটু জল,—আর যে পারি না প্রভু!...

"সুজিতবাবু!"

অকস্মাৎ—আমার নাম ধরে কে ডাকে না?...চম্‌কে উঠে বসতে গিয়ে কাঁধে এমন একটু চাপ অনুভব করলাম যে, তা' ঠেলে ওঠা আমার সকল শক্তির অতীত ব'লে মনে হ'লো,—একান্তভাবে নিজের শরীরটা সেই টানে শিথিল ক'রে পড়ে রইলাম। দেহের অণুপরমাণু বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, কিন্তু তাদের মালিক সেই আকর্ষণেই

আশ্রয় নিলে।—দুরন্ত শিশু তার পরম আশ্রয়ে শুয়ে শুয়ে স্বভাব মতো হাত-পা ছোঁড়ে, অথচ সে স্থান থেকে সরিয়ে নিলে স্বস্তি ত' সে পায় না বরং অভাবনীয় কাণ্ড বাধিয়ে বসে,—ফলে তাকে তার সেই চরম আর একান্ত আশ্রয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়, তখন যেমন যাদুমন্ত্রে তার স্বরূপ বদলে যায়,...তেমনি আমারও মনে হলো। —মনে হলো, যেন কোন অনাদি অতীত কাল থেকে এই আশ্রয়টিকে পাবার জন্যে জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত ছুটেছি!—মন-প্রাণ যেন যুগ-যুগান্তরের কোন অন্ধকার কারাগারের প্রাচীরে ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে খেতে হঠাৎ আজ মুক্ত প্রান্তরের পরিপূর্ণ আলো-বাতাস পেয়ে তারই কোলে লুটিয়ে পড়ে শুধু বললে, "আঃ!"...

কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে মুখের কাছে মুখ এনে মায়া বল্‌লে, "সুজিতবাবু, মাথার অসুখটা কি আবার বাড়লো?"

স্বপ্ন—স্বপ্ন,...তা না হ'লে এমন করে বলবার ত' আমার কেউ নেই!...ওগো, সত্যই বল্‌ছি, আমার বল্‌তে এতো বড়ো জগতে কেউ নেই,—আছে শুধু একমাত্র জলন্ত আগুন ভরা পিস্তল আর তার লক্ষ্য!...এ স্বপ্ন,—মায়া,...কিন্তু......

—"বিনু, তিনকড়িকে একবার ডাক্‌তো!"...

"কি হ'লো মা মায়া!"

আনন্দবাবু ব্যস্ত হ'য়ে আমার কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "উঃ, কপালটা যে পুড়ে যাচ্ছে মা, কিন্তু গা ত' বেশ ঠাণ্ডা! ওরে ও তিনকড়ি একবার ব্রজেনের কাছে যা-ত' বাবা, বলবি তোর সঙ্গেই যেন চ'লে আসেন।"

"সুজিত-সুজিত, কেমন আছ বাবা? না-না, উঠোনা-উঠোনা, চুপ ক'রে শুয়ে থাকো,—মায়া সেই মালিসটা ততক্ষণ লাগিয়ে দেতো মা!"

প্রবল প্রতিবাদ ক'রে জানাতে চাইলাম যে আমার কিছুই হয়নি—কিন্তু তা না শুন্‌লেন ঐ স্নেহান্ধ বৃদ্ধ আর না শুন্‌লে এই রহস্যময়ী মায়া!

আশ্চর্য্য এই মায়া!...তার দুঃখের তার ব্যথার এতটুকু ভাগ কাউকে দেবে না,—যদি কেউ নিতে যায়, দৃপ্তা সিংহীর মতোই অপূর্ব্ব তেজে স্তম্ভিত ক'রে দেয়; কিন্তু অপরের বেদনা, অন্যের যন্ত্রণা-কাতর মুখের সমস্ত গ্লানি সমস্ত কষ্ট নিঃশেষে মুছে নেবার জন্যে তার দু'খানি হাত যেন শত হ'য়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে!...একমাত্র ভাইকে হারিয়ে সেদিন যখন আমার হাতের 'পরে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছিলো—আমার চেষ্টায় সম্বিৎ পেয়ে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন মনে হলো যেন সে কোন রাজ-রাজেন্দ্রাণী;—তার কাছে আমি যেন দীনতম হীনতম একটা পথের ভিখারী!...সে মূর্ত্তির কাছে যদি এগিয়ে যাই, তা হ'লে শত-শত উন্মুক্ত কৃপাণ ছুটে আসবে—জানিয়ে দেবে আমার ধৃষ্টতা আমার অক্ষমতা!...কিন্তু আজ, সেই কাঙাল ভিখারী যখন নিজের বোঝা হারিয়ে চলার শক্তি ভারে নুয়ে পড়লো তখন সেই রাজরাজেশ্বরী মুহূর্ত্তের মধ্যে হ'য়ে পড়লো মহিমময়ী নারী,—আমার সকল ভার-সমস্ত গ্লানি সরিয়ে দিতে আমারই পাশে এসে দাঁড়ালো!...

এখন ভাবি, এই যে এতো বড়ো একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে

গেলো,—আমার এতো দিনের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার আমূল ওলোট্-পালোট্ হ'য়ে গেলো, সে কার ইঙ্গিতে?...রাজার অপ্রতিহত শক্তি যাকে এতোটুকু দমাতে পারেনি—তাকে এতো অল্প দিনের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে-দ'লে-পিষে একটা জড়পিণ্ড করতে এতটুকু বেগ পেতে হলো না—সে শক্তি কী! যেন কোন দৈত্য এতোদিন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো—হঠাৎ যখন তার ঘুম ভাঙলো, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মতোই সামনে যা পেলে মুঠো মুঠো মুখে তুলে দিলে,—না হলো তার জড়তা—আলস্য ভাঙবার প্রয়োজন—না হলো তার চোখ খুলে তাকাবার অবসর!......

এই যে, আজ আমি জগতের কাছে ব্যঙ্গের পাত্র হ'য়ে পড়েছি—কে ভাবতে পারে সারা বাঙলায় একদিন যে ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা চলেছিলো, তা শুধু আমারই চেষ্টায়, একমাত্র আমারই শক্তিতে! কিন্তু আজ শুধু এইটাই বড়ো হ'য়ে নিরন্তর আমায় আঘাত দিচ্ছে, যে, ভগবান্, যদি তোমার শুধু ধ্বংসেরই সহচর করেছিলে তবে, মানুষ করেছিলে কেন? কেনো দিয়ে ছিলে আমার এই চওড়া বুকের তলে এতো বড়ো দুর্ব্বলতা যার জন্য আজ আমি জগতের চ'ক্ষে শুধু আবর্জ্জনা—উপসর্গ-মাত্র!...নিরন্তর পুড়ে পুড়ে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি—ওগো ভগবান, তুমিও শোন,—ধ্বংসের আগুন শুধু ধ্বংসই করতে পাবে, সৃষ্টি করতে পারে না,—সৃষ্টি হয় ত্যাগে!...

হঠাৎ যখন তন্দ্রা ভাঙলো দেখি মায়ার পরিবর্ত্তে প্রভা মাথার শিয়রে ব'সে হাওয়া করছে, বেশ একটু আশ্চর্য্য হলাম, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে আমার মুখে আর কথা সরলো না—শুধু অপলক চোখে চেয়েই রইলাম !

আমাকে চাইতে দেখে প্রভা বললে, "কেমন আছেন সুজিতবাবু ?"

কে বলবে এই প্রভাই একদিন নিজের গর্ব্বে ধরাকে সরাজ্ঞান করতো—কে বলবে এই কথাগুলিই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, অপরূপ সুন্দরী প্রভার কথা ! মনে হ'লো যেন রুদ্র-বৈশাখের তাণ্ডব নৃত্যে তার মতো কিছু অসত্যের দৈত্য-দানব দলিত মলিনতাকে দ'লে-পিষে-মথিত করে রেখে গেছে যা কিছু সত্যশিব সুন্দর ;—তাই তার সে রূপ আছে দীপ্তি নেই, শ্রী আছে তেজ নেই, স্বর আছে জ্বালা নেই ! .....চুপ করে আছি দেখে আবার ডাকলে,—"সুজিতবাবু !"

এবার সাড়া দিয়ে বললাম,—"ভালো আছি প্রভা !"

"কিছু খাবেন, দুধ কি বেদানার রস ?"

ভয়ঙ্কর হাসি এলো।—এরা ভেবেছে আমি সত্য সত্যই রুগী, শয্যাত্যাগ ক'রেছি কি অনর্থ ঘটে যাবে ! কিন্তু এরা তো জানেও না যে, যাকে তারা গরম দুধ আর বেদানার রস খাইয়ে গদি-আঁটা বিছানায় শুইয়ে পাখার বাতাস দিচ্ছে, সেই ঘরই অন্ধকার রাত্রে দশ ক্রোশ পথ লাঠির ভরে পার হ'য়ে একটা জেলা-অধিশ্বর অত্যাচারীকে মাত্র একটি বোমার আঘাতেই তার সুখ নিদ্রার বদলে

কাল-নিদ্রায় শুইয়ে—নির্ম্মলের প্রতিশোধ নিয়ে এসেছে !...একবার মনে হ'লো ছুটে গিয়ে দেখিয়ে দিই যে, আমি রুগী নই—রোগশয্যা আমার নয় ;—এই দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় আছাড় খাচ্ছে, স্বেচ্ছাচারী শাসকের মাথাগুলো ধূলার মতো গুঁড়িয়ে দেবার দুর্ব্বার শক্তি !...নিজেকে সামলে নিলাম, বললাম, "এখন আর খাবার ইচ্ছে নেই,—বিনয় কোথা গেছে প্রভা ?" বলে উঠে বসতে যাচ্ছি ব্যস্ত হ'য়ে সে বলে উঠলো—"উঠবেন না সুজিতবাবু, উঠবেন না !"

এবার হেসে ফেললাম। উঠে বসে তার দিকে চেয়ে কি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কে যেন চাবুক মেরে আমার হাসি আর কথা বন্ধ করে দিলে, বেশ একটু ব্যথা লাগলো—সান্ত্বনায় সমস্ত মন ভ'রে উঠলো বললাম, "প্রভা, আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, আমার এ অসুখ আর সারবেনা, হয় পাগল, নয় শেষ, এ দুটোর মধ্যে একটা কিছু যে হ'বে তা আমি প্রতিনিয়ত বুঝছি !... দুনিয়ার এমন কোনও ডাক্তার নেই যে, আমাকে এ মরণের হাত হ'তে বাঁচাতে পারে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মরণ আসবার জন্যে আসা-যাওয়া করছে—প্রতি মুহূর্ত্তে আমি তার পায়ের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, এমনি ধারা যারা মৃত্যুপথের যাত্রী তাদের জন্যে কেন তোমরা কষ্ট পাও প্রভা !"—নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখেই কথাগুলি বললাম। শুনে সে যেন চমকে উঠলো, তার পর বললে,—"আপনি যখন তখন নিজেকে পথিক পথিক কেনো যে বলেন তা আপনিই জানেন, কিন্তু আজ আমিও সেটা জানতে

চাই; সেদিন যদি সত্য সত্যই আসে অন্ততঃ অন্ধকারে যাতে হাত্‌ড়ে বেড়াতে না হয়, তার জন্যেও জেনে রাখা আমার বিশেষ দরকার!" একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "আপনি পড়াবার সময় অনেক কথাই বলতেন, তখন তা খেয়ালেও আনিনি বরং তা থেকে পাশ কাটিয়েই গিয়েছি। দাদাও মাঝে মাঝে আপনার মতোই বল্‌তেন কিন্তু সে কথা বুঝে ওঠবার মতো মনের অবস্থাও আমার ছিল না—যখন খেয়াল হ'লো তখন দেখি তিনি আমাদের সকল শক্তির বাইরে!...আজ আমার কি মনে হয় জানেন সুজিতবাবু,—যে উদ্দেশ্য: নিয়ে দাদা দেশে ফিরেছিলেন, আপনিও ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবে পথ আর মত হয়তো আপনাদের আলাদা;—তা কি সত্যি সুজিতবাবু?"

তার মনের সংশয়টুকু যাতে দৃঢ় না হ'তে পায় সেই জন্যে তাড়াতাড়ি হাত দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, "তাঁর নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে আমার পাপের বোঝা আর ভারী কোরোনা প্রভা,—তিনি আমাদের নমস্য! তা ছাড়া তিনি ছিলেন যে সত্যকার স্রষ্টা, আর আমরা শুধু বচন-বাগীশের দল—তর্ক করতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু যাকে সত্যকার গড়া বলে তা পারি না! পাখার নীচের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভ্রমণ-কাহিনী লেখায় আর বনে বনে, জঙ্গলে জঙ্গলে বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে—ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে লেখায় যে আকাশ পাতাল তফাৎ প্রভা!......যাক্‌, তিনি কি বল্‌তেন?"

"কি জানি সুজিতবাবু, সব কথা ভালো মনে নেই, আর

আমাকে তিনি বিশেষ কিছু বলতেনও না—যতো তাঁর পরামর্শ চলতো বৌদি আর মায়াদির সঙ্গে। তাই দেখেন না, গ্রামটায় আজ সাড়া প'ড়ে গেছে শিক্ষিত আর অর্দ্ধ শিক্ষিত মেয়ে মহলে!... ঐ যে পাকা রাস্তার ধারে দীঘির পাড়ে যে পাকা দেওয়াল দেওয়া খড়ের আটচালাটা হচ্ছে ঐটি হ'বে মেয়েদের স্কুল, মায়াদির টাকায় আমার মায়ের নামে। আর আপনার স্কুলটা হবে দাদার নামে—তবে পাকাপাকি ভাবে হতে দেরী আছে। এ সব মতলব দাদাই ঠিক ক'রেছিলেন।...সেদিন আমি এসব কাজের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়েছিলাম, সেদিনকার তাঁর সেই দীপ্ত সজল মুখখানি আমার আজও চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করেছ!...আমার সকল তর্কের মুখবন্ধ ক'রে তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি বাঁচি তো দেখতে পাবি প্রভা, আমার এই কাঁটা বনেই একদিন সোনার ধান সগর্ব্বে মাথা তুলে হাওয়ায় দুলছে—কিন্তু তোরা যদি আমার সঙ্গে না লাগিস ত' আমি একলা কেমন ক'রে পেরে উঠব ভাই।" বলতে বলতে আত্মগ্লানির ভাবে তার গলার স্বর ভারী হ'য়ে এল, উদ্গত অশ্রু গোপন করবার জন্যে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিন্তু এ কি শুধু আত্মগ্লানি?......সংশয় এসে কি জানি কেন আমার মনকে বারবার দোলা দিতে লাগল,—এই যে প্রভা অনুশোচনার ভারে আজ নত হ'য়ে প'ড়েছে, মনে হ'ল যেন কী একটা পাবার একান্ত বাসনাই আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ওকে

নুইয়ে দিয়েছে,—শুধু এই পথটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ও যেন নিজেকে খাড়া রাখতে চায়!......

বললাম, "জানো প্রভা, দুঃখের মধ্যে দিয়ে পাওয়াটাই আসল পাওয়া, উত্তেজনার মুখে পাওয়াটা সব সময় তার গতি ঠিক রাখতে পারে না,—ফলে তার আখেরও সুখের হয় না! তখন যদি ঝোঁকের মাথায় দাদার দলে ভিড়ে যেতে, পরে হয়ত তোমার এমন অবস্থা আসতো যার জন্যে মনস্তাপের আর অবধি পেতে না; কিন্তু আজ দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে তুমি যে জিনিষটি পেয়েছ— সেইটিই উজ্জ্বল খাঁটি সোনা!...আজ আমার সব কথা বুঝবেও না, আর আমিও বোঝাতে পারব না,—কিন্তু এমন দিন হয় ত' আসবে যে দিন তোমার কাছে এই দিনটিই সকল দুঃখের কারণ হ'য়ে সারা জীবন তোমায় বিঁধবে, তোমাদের কাছে যা কিছু শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি, সেদিন হয়ত, সে সমস্তই তোমাদের কাছে তিক্ত হ'বে উঠবে!— তবু আমার এই কথাটি মনে রেখো যে, আমি আর যাই হই নিজের স্বার্থের পায়ে নিজেকে বেচে দিইনি!...সত্য বলে সেটাকে প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করেছি—জ্ঞানত সে সত্য ভাঙিনি—ভাঙ্বোও না; তাতে আমার সামনে যত বাধা যত বিপত্তিই এসে দাঁড়াক!... নিজের স্বার্থের জন্যে সত্য-পথের ছদ্মবেশ পরার চেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া ঢের ভাল বোন, তাতে দুঃখ আছে মানি কিন্তু জ্বালা নেই!" বলে চেয়ে দেখি তার মুখখানি পলকের মধ্যে মরা মানুষের মত সাদা হ'য়ে গেল,...কিন্তু সেদিকে যেন আমার নজর যায়নি এমনি ভাবে আমার ডান হাতটি তার মাথার 'পরে রেখে বল্‌লাম,—জানিস্

দিদি, দাদার কথা আমি কিছুই জানি না, তিনি থাক্‌লে কি বলতেন তাও আমার ধারণা নেই, তবু আজ আমার মনে হচ্ছে—আমরা যে পথেই চলিনা কেন, তোদের পক্ষে সব চেয়ে শ্রেয় আর একান্ত হচ্ছে প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক ঘরটিকে দখল করা,—আর সেইটিই হবে সকল শিক্ষার সার। লেখা-পড়া শেখালে যা হবে তার চেয়ে ঢের বেশী ফল হ'বে যদি জনসাধারণকে আজ্ঞাবাহী করতে পারো,—তাদের মনে নেতাদের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসকে যদি দৃঢ় ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে পারো! নারী-জাতির মনের মধ্যে দিয়েই পুরুষকে দলে আনা পথের একমাত্র সহজ সরল উপায়!" বলে আমি ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ে তার মুখের প্রতি চেয়ে মন স্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌লো এই ভেবে যে, যে ব্যথাটা বুকের মাঝখানে প্রতিনিয়ত কাঁটার মতো বিঁধ্‌ছিলো আজ সেটাকে সহজেই অপসারিত করতে পেরেছি!......

আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌লে,—"তা হ'লে দাদা, তুমি কি বল্‌তে চাও, তিনি ভুল পথেই গেছেন আর দিদি বৌদি তার জের টেনে চ'লেছে?"

আমি একটু হেসে বল্‌লাম,—"তুমি ভুল ক'রছ প্রভা, আমি তাঁর প্রতি কেন কারুর প্রতিই কটাক্ষ ক'রে এ কথা বলিনি—বল্‌তে পারিও না,—এ সকল বিষয়ে আমার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা এক কাণাকড়িও নেই যার জোরে কথা বল্‌ব,—শুধু দেখে শুনে যা মনে হয়েছে তাই বলেছি।......আজ আমাদের যা অবস্থা তাতে সবই দরকার—বিশেষ ক'রে শিক্ষা-সংস্কার, কিন্তু তার চেয়ে বড়

দরকার যে ভাই, সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া যাতে আগাছা দূর করতে গিয়ে পায়ের শেকলে টান না প'ড়ে।......আমাদের এই শান্তশিষ্ট দেশে এমন কতকগুলি লক্ষ্মীছাড়া খেয়ালী উদ্ধত লোক আছেন যাঁদের সংসার-গিরিগহ্বরের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নেই,—মরণ যাঁদের খেলার সাথী, তারা বলেন,—"আমার দেশে—আমার বাড়ীতে যদি জোর ক'রে কেউ বাস ক'রতে আসে আমার কি সে অধিকারটুকুও নেই যে, তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিই"—এঁদের-ই বা কি উত্তর দেবে,—মেনে নিতেও যেমন পারা যায় না, তেমনি উড়িয়ে দিতেও বাধে!"......

"প্রভার হ'য়ে আমি-ই জবাব দিচ্ছি সুজিত বাবু।" বলে মায়া এক বাটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকে আমার কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখে দুধের বাটিটা মুখের কাছে এগিয়ে দিলে।—তার এই ব্যবহারটা এমনই সহজ সরল যে, মোটেই দৃষ্টি কটু বলে মনে হ'ল না। প্রভার দিকে চেয়ে স্বস্তিতে মন ভ'রে উঠল, মস্ত বড় একটা যেন দায়িত্বের হাত থেকে আজ আমি অব্যাহতি পেলাম। এ সংশয় আমি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারিনি যে, প্রভা এ দুনিয়ার সকলের সামনেই নিজের মান স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়ে চল্‌তে পারবে, কিন্তু মায়ার সাম্‌নে হয় ত' তার দুর্ব্বলতাকে সম্পূর্ণ ঢাক্‌তে পাবে না!

খালি বাটিটা মায়ার হাতে দিয়ে "আঃ"! বলে শুয়ে পড়লাম। আমার কপালে আগের মতই হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মায়ার দিকে ফিরে প্রভা বল্‌লে, "দিদি, কই দাদার কথার উত্তর দিলেনা তো!"

হঠাৎ, মায়ার সর্ব্বশরীর যেন একটা প্রবল দম্‌কা ঝড়ে দুলে উঠ্‌লো—তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে পিছন ফিরে বাটিটা দরজার কাছে রেখে আমায় একটু ঠেলে দিলে, তারপর হাত ধুয়ে ফিরে এসে চৌকির ধারে প্রভার কাছে বসে তাকে বল্‌লে, "বলছি ভাই!"...

আমার দিকে চেয়ে বললে, "দেখুন সুজিত বাবু, গলা ধাক্কা দিয়ে বের করতে পারা কথাটা শুন্‌তে বেশ লাগে আর মোহনীয়ও বটে.কিন্তু তাতে যেমন চাই দেহের শক্তি তেমনি চাই শরীরের সামর্থ্য!—যে শরীর নিয়ে তাদের গলা ধাক্কা দিতে যাবেন সেই শরীরটারই যদি স্বাধীনতা না থাকে তা হলে সে যাওয়ায় দুঃখ বাড়ে বই কমে না,......তার চাইতে এ ক্ষেত্রে হাতে না মেরে ভাতে মারাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?—এতে মনোবৃত্তির পরিচয়ও যেমন থাকবে তেমনি থাকবে সত্য-ন্যায় ধর্ম্মের পরিচয়—যা শুধু আমাদের এই মা-টিরই নিজস্ব!"

নিজেকে চেপে গেলাম। এর উত্তরে অনেক কিছুই বলতে পারতাম কিন্তু মায়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে যদি আমার স্বরূপ ধরা পড়ে তা হ'লে আমার সকল পরিশ্রম সকল উদ্যম যে মাঠে মারা পড়বে; আবার কবে কতদিনে সে ক্ষতি যে পূরণ করতে পারবো তারও নিশ্চয়তা নেই।—তাই বল্‌লাম, "মায়া, তোমার আসবার একটু আগেই প্রভাকে বলেছি,—এ সব বিষয়ে আমার সত্যিকারের অভিজ্ঞতা কাণা কড়িরও নেই যার জোরে বলতে পারি এটা ঠিক ওটা ভুল!—তা সত্ত্বেও যারা বলতে যায় তারা জলে না নেমেই

সাঁতার সম্বন্ধে সমালোচনা করার মতো বোকামীটাই শুধু প্রকাশ করে। আমি শুধু সাধারণ বুদ্ধির 'পরেই বলেছি ও বলছি যে মেয়েদের সাঁতার শেখাতে যদি সত্যি সত্যিই হয় তা হ'লে জলে নামবার আগে অন্ততঃ কাপড়গুলি হাতে পায়ে জড়িয়ে যাতে বিপদ না বাড়ায় তার ব্যবস্থা ক'রে যেন জলে নামান হয়! এমনি ধারা দেশের কাজেও মেয়েদেরই সাহায্য না নিলে দেশের কাজ চল্‌বে না—আর তাঁরা কি ভাবে সাহায্য করলে সব দিকে ভালো হয় এটা দেখা আগে দরকার। জন সাধারণকে জাগিয়ে তোলা তাঁদের পক্ষেই সম্ভবপর,—তাঁরা দেবেন শক্তি আর পুরুষ করবে কর্ম্ম, তবেই এ কাজ যেমন হবে পূর্ণ তেমনি হবে সহজ!"

"খুব সত্যি কথা,—এটা আমিও যেমন মানি দাদাও তেমনি মানতেন।......তিনি বার বার বল্‌তেন—শক্তি যেখানে অচেতন সেখানে কর্ম্ম কর্ম্ম হ'য়েই থাকে কাজে কিছুই হয় না,—তাই আগে চাই শক্তির উদ্বোধন!—কিন্তু কথায় কথায় এদিকে যে কত রাত হ'য়ে গেছে সে দিকে কারুর খেয়ালই নেই,—নিন শুয়ে পড়ুন; রাত জেগে বক্‌লে মাথার অসুখ বাড়বে বই কম্‌বে না!" বলে দুধের বাটি নিয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে প্রভার সঙ্গে মায়া চ'লে গেলো!......শুয়ে শুয়ে এই কথাই শুধু মনে হতে লাগলো,—আমার সকল ভণ্ডামীর খোলস যেদিন সত্যের কঠোর আঘাতে খুলে পড়বে সে দিনের সেই নগ্ন বীভৎসতাকে এঁদের সামনে থেকে কি দিয়ে ঢেকে রাখবো?......

= সাত =

দেখতে দেখতে সেই দিন এসে প'ড়লো যে দিনের অপেক্ষায় আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা জন্মের মতো সমাধি হ'লো,—এমন ভাবে সমাহিত হ'লো যে তার এতোটুকুও অবশিষ্ট রইলো না!......এর চেয়ে যদি ধরা পড়তাম,—যদি জেল-ফাঁসী-দ্বীপান্তর একটা কিছু হ'তো তা হলে যে অনেক ভালো হ'তো,—তাতে আর কিছু না হোক মরণোৎসবের অভিযান তো সুরু হতো?......চলার পথে অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে দেখতো তো,—চলে হয়তো বেশীই যেতো, তবু, তবু কি কারুর মুখ দিয়ে "আহা" বেরুতো না,—এক জনেরও কি হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌তো না,—চোখে জ্বলন্ত আগুনের দীপ্তি ফেটে পড়তো না;—অত্যাচারী দুঃশাসনের উত্তপ্ত-শোনিতের জ্বালাময় পিপাসা ভীমের মতই তাদেরও বুকে কি তীর হতে তীব্রতর হ'য়ে ক্ষিপ্ত-পাগল-উন্মাদ ক'রে তুলতো না?—সেইটুকু, সেইটুকুতেই আমার সকল আরাধনা—সকল সাধনা মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তো যে!......ওগো সকল বিধানের বিধাতা, আজ নিঃস্ব-রিক্ত জীবনের মহাশ্মশানের তীরে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে এইটুকু ভিক্ষা চাই,—

আমার মত যারা পথের নেশায় উন্মত্ত, তাদের মাথায় তোমার পদ্ম-হস্তের স্পর্শ দিতে যদি তোমার পাষাণ বুকে বাধে—দিও না, কিন্তু তাদের বুকে ব্যর্থতার জগদ্দল পাথর না চাপিয়ে তোমার উদ্যত বজ্রের তলায় মাথা রেখে যাতে তারা মর্ত্তে পায়—ওগো নিষ্ঠুর, তাই ক'রো !......

বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তায় যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন হঠাৎ জানালার বাইরে বাগানের মধ্যে বেড়ালের "ম্যাঁও ম্যাঁও" কান্না শুনে আমার চমক ভাঙ্লো, ধীরে ধীরে উঠে ঘরের দরজা খুলে বাড়ীর ভিতর চাইতেই দেখি সারা বাড়ীটা নিঝুম—নিথর খাঁ-খাঁ করছে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বাগানের জানলাটা খুলে বার দুই কাশতেই আমার একনিষ্ঠ সেবক—সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী—সোদরোপম প্রিয় শিষ্য সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো, কোমর থেকে একতাড়া চাবি আর আমার বহু বিপদের বন্ধু—শত্রুর সাক্ষাৎ মৃত্যু সেই পিস্তলটি আমার হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে বললে "দাদা, কেমন আছো—পারবে তো ?—না হয় আমাকে সব সন্ধান বলে দাও আমিই যাই, রমেন বরং এখানে অপেক্ষা করুক !—কি বলো ?"

জিনিষ দুটা নিয়ে একটু হেসে বললাম "তোর দাদাকে কি আজও চিনতে বাকী আছে সু ?—এ হাড়গুলোতেও যে ভেল্কী খেলতে পারে তা কি তুই জানিস না !" তার দিকে চাইতেই দেখি আমার কথায় সে লজ্জিত হ'য়ে উঠছে, কিন্তু তার চোখ দুটিতে যে কী অসামান্য মিনতি ফুটে উঠ্ছে সেই আধ আলো

ছায়ায় স্পষ্ট দেখতে না পেলেও বেশ অনুভব কর্‌লাম,—মনটায় দ্বিগুণ উৎসাহ ভ'রে উঠলো !...

মায়ার আর আনন্দ বাবুর শোবার ঘর দুটির মাঝে যে ছোট ঘরটি আছে সেইটিই জমিদারের কোষাগার, আর তারই একটা দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুকে থাকে তাঁদের দলিল-পত্র আর খাজনা আদায়ের টাকা কড়ি। এই ঘরের মাত্র দুটি দরজা— একটি মায়ার ঘরে আর অপরটি আনন্দবাবুর ঘরের মধ্যে দিয়ে, যদি দুটি দরজাই এক সঙ্গে খোলা হয় তা হ'লে মায়ার আর আনন্দ বাবুর ঘরের যে কোনটায় দাঁড়ালেই অপর ঘরটি পরিষ্কার দেখা যায়। এখন মুস্কিল বাধলো কার ঘর দিয়ে যাই—মায়ার না আনন্দ বাবুর ?...

লোহার থাম বেয়ে উপরের বারান্দায় গিয়ে দেখি শীতের জন্য আনন্দ বাবুর ঘরের সমস্ত জানালা গুলিই বন্ধ শুধু মায়ার ঘরের সর্ব্বশেষ জানালাটিই খোলা র'য়েছে। আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করে দেখেও যখন কোন সাড়া শব্দ পেলাম না তখন জানালার মোটা মোটা লোহার দুটি রড্ ফাঁক করে বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়লাম—এতটুকু বেগ পেতে হ'লো না !

এর পর বিনা পরিশ্রমেই লোহার সিন্দূক খুলে নোটের তাড়া আর টাকার থলিটি নিয়ে চোর কুঠুরীর দ্বারের কাছে এসে যেমন ঘুরে বেরিয়ে আসতে যাবো হঠাৎ কে যেন দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো,—কিন্তু সেইটুকুই মাত্র, তারপরই ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ কক্ষ কাঁপিয়ে আমার হাতের পিস্তল গর্জ্জে উঠলো !...

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ছায়া-মূর্ত্তি "উঃ !" বলে ধীরে ধীরে দেওয়াল ধ'রে ব'সে পড়লো। তাড়াতাড়ি দরজা থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে আস্‌তেই সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো,—"তু—মি ?"......

সেই শব্দে আমার সমস্ত শরীরটাকে যেন কোন যাদুকরের রূপার কাঠি ছুঁইয়ে পাষাণ ক'রে দিলে ! হাত থেকে টাকার থলিটা ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ে গেলো,—চম্‌কে উঠলাম, আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি সজাগ হ'য়ে উঠলো। ব্যস্ত হ'য়ে টাকার থলিটা তুলে নিয়ে সেই ছায়া মূর্ত্তির কাছে গিয়ে হেঁট হ'য়ে অশেষ মমতা ভ'রে তার মুখের চুলিগুলি সরিয়ে দিয়ে বেশ সহজ সতেজ গলায় বললাম,—"মায়া, বিপ্লবীর রক্তাক্ত বুকে তোমাদের মতো দেবীর প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া শুধু পাপ নয় মহাপাপ,—করতে নেইও ! ভুলে যেও,...ঘৃণা করো !"...বলে উঠে দাঁড়াতেই দেখি তার দেহটি ধীরে ধীরে মাটির'পরে লুটিয়ে পড়লো,—আমি মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে কোনও মতে জানলা গলে বেরিয়ে পড়লাম !......

নিজের ঘরে এসে সুপ্রকাশের হাতে চাবি, পিস্তল, টাকার থলি আর নোটের তাড়াটা দিয়ে, তার বুকে হাত রেখে জোর করে ঠেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লাম, "সু, আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়াস না—পালা—পালা !" সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে দিলাম।... এর মধ্যেই আনন্দ বাবু তাঁর ঘরের জানলা খুলে হাঁকা-হাঁকি সুরু করেছেন,—বৃদ্ধের সে ভয়-বিহ্বল চীৎকার বেশী দূর পর্য্যন্ত যাবার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছিলো কিন্তু সারা বাড়ীটা বেশ সচকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এমন সময় ফটকের ধারে "গুড়্‌ম্‌—গুড়্‌ম্‌"

শব্দে পিস্তল গর্জ্জে উঠলো,—হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ক'রে লোকজন ছুটলো!—আমিও বাগানের দরজা খুলে ফটকের দিকে দৌড়ুলাম,—হঠাৎ পায়ে কি একটা বেধে গেলো, টাল সামলাতে পারলাম না—মাথা ঘুরে সেই ঘাসের ওপর প'ড়ে গেলাম।......

তারপর যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি, আমি একটি ছোট ঘরের সামান্য একটা বিছানায় পড়ে আছি—উঠ্তে গেলাম পারলাম না; মাথাটা যেন বিশ মন ভারী! মরার মতোই প'ড়ে প'ড়ে ভাব্বার চেষ্টা করলাম যে,—ব্যপারটা কী?—কিন্তু তাও পারলাম না, যতোই একটা খেই ধ'রে ভাব্তে যাই ততোই আরও জড়িয়ে পড়ি;—এমনি গোলমালে আমার সমস্ত ওলোট্-পালোট্ হ'য়ে গেলো!

ক' দিন কি ক' ঘণ্টা পরে তা ঠিক মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে—সেই খাটিয়ার ধারে পা ঝুলিয়ে হাতের মধ্যে মাথা রেখে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছি এমন সময় কিসের শব্দে মুখ তুলে চাইতেই দেখি সামনে বিষাদের প্রতিমা প্রভা আর তার হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে গভীর রাত্রের মুহ্যমান পাখীর মতো আমার হরবোলা বিনয় দাঁড়িয়ে!...আস্তে আস্তে আমার পায়ের কাছে ব'সে আমারই হাঁটুর প'রে মাথা রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রভা ডাকলে—"দাদা!"......

আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্লো—মাথায় মধ্যে যেন দেব-দানবের

সমুদ্র-মন্থন সুরু হলো;—বিনয়কে প্রাণপনে বুকে চেপে ধরে কতকটা সামলে গেলাম!...নিজের ডান হাতটি কোনও মতে তার মাথার'পরে রেখে বল্‌লাম, "প্রভা, আমি জানি তুমি যা বলবে,—কিন্তু সত্য হোক—মিথ্যা হোক, আমাদের কিছুই বল্‌তে নেই যে ভাই!"......

চকিতে জলভরা মুখটি তুলে সে বল্‌লে, "আমার মাথা খাবে দাদা, যদি ও কথা ফের বল্‌বে;...মায়াদি লিখে সই ক'রে দিয়েছে যে, সে স্পষ্ট দেখেছে তুমি নও—তারা অন্য লোক!"

"কি-কি, কী বল্‌লে প্রভা;—কী বলেছে সে?" অসম্ভব রকম চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু এতটুকুও শব্দ আমার গলা থেকে বেরুলো না, শুধু জ্ঞান হারিয়ে খাটের'পরে প'ড়ে গেলাম।

*

* *

বোধ হয় এর পরের দিন।

হঠাৎ, জেলার সাহেব হাসি মুখে আমায় তাঁর রাজত্ব থেকে নির্ব্বাসন দিলেন একেবারে মুক্ত রাজপথের পরে। পাশেই দেখি বৃদ্ধ দেওয়ান আর অনিল দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখে অনিল এগিয়ে এসে একটা হাত ধ'রে বল্‌লে, "একটু তাড়াতাড়ি চলুন, তা নইলে দু'টোর গাড়ীখানা পাওয়া যাবে না।"

বৃদ্ধ দেওয়ান একেবারে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেললেন,—শোকের আবেগে তাঁর সকল কথাই এলোমেলো হ'য়ে উঠলো। চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লেন, "বাবা, গিয়ে যে মায়ের আমার দেখা পাবে

সে ভরসাও নেই,—তবু, তোমাকে যে এই নাগপাশ থেকে ছাড়াতে পেরেছি এইটুকুই যা সান্ত্বনা,—আর এও তো আমার মায়েরই কথায়! তাই কাল যখন উকিল ব্যারিষ্টার আর ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আস্তে আস্তে মা আমার বল্‌লে, "আপনারা জানেন না তিনি আমাদের কতো বড়ো উপকারী বন্ধু,—তাই তাঁর'পরে এতো বড়ো অপরাধের বোঝা চাপাতে আপনাদের বাধছে না! ..তিনি যে নিজের অমূল্য জীবনটাকে তুচ্ছ ক'রে আমার পিতৃতুল্য মেশোমশাইকে আর আমাকে রক্ষা করেছিলেন!—ডাকাতের লাঠির আঘাতে যখন তাঁর মাথা ফেটে যায় তখন এই আপনার ডাক্তার বন্ধুই বলেছিলেন—ভাল আমি করতে পারবো এ নিশ্চয়তা দিতে পারি কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বল্‌তে পারিনা; যে রকম ভাবে এঁর মস্তিষ্ক জখম হ'য়েছে খুব সম্ভব, পরে বিকৃতও হ'তে পারে কিম্বা পরে সুস্থ হলেও যদি কোনও রকম মানসিক আঘাত পান তখন নিশ্চয়ই এঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যাবে না। —কোনও রকম মানসিক আঘাত আর তাঁকে পেতে হলো না—আরোগ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা বিকৃত হয়েছিল—এটা শুধু ডাক্তার কেন বাড়ীর এতটুকু একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনারা জানতে পারবেন!......আর আমাকে খুন করার কথা যেটা সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা;—আমার ঘরে একজন লোক ঢোকেনি, ঢুকেছিলো দুজন, তার মধ্যে একজনও যে সুজিতবাবু নন এটা আমি বেশ স্পষ্ট দেখেছি!—তাঁর সেবা করতে করতে তাঁকে আমি এমনি চিনেছি যে তাঁর ছায়া দেখলেও আমি ধরে দিতে পারি",—তাই তো

বাবা তোমাকে আমরা ছাড়াতে পেরেছি, কি যে তোমার ওপর ঐ দারোগা ব্যাটার বিষ-নজর সে আমার পাকা মাথায় আজও ঢুকলো না!"...এমনি ধারা সারা রাস্তায় তাঁর মায়ের কথা যেন আর ফুরুতেই চায় না!......

হয় ত' এসব কথা সত্যি নয়,—হয় ত' বা কতক তাঁর মন গড়া—হয় ত' সব জানলেও গুছিয়ে বল্‌তে পারেননি,—কিন্তু আমি আমার সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথাই যেন গিল্‌তে লাগলাম; বাইরে তার প্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানি না,—মনেও নেই, খেয়ালও করিনি! কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, যাওয়া উচিত কি অনুচিত এটুকুও খেয়াল করিনি; শুধু তাঁরা যাচ্ছিলেন আমাকেও যেতে হবে, এমনি উদাসীনের মতো সারাটা পথ হেঁটে যখন ষ্টেশনে এলাম, গাড়ীটাও ছেড়ে দিলো—দুজনে এর জন্যে তাঁরা অনেক আপশোষই করতে লাগলেন—কিন্তু আমার মনের পরিবর্ত্তন এতটুকুও হলো না!...

এখন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো—কি ক'রে যাওয়া যায়? গাড়ীর আশায় থাকতে হ'লে কাল ঠিক এমনি সময়ের অপেক্ষায় কাটাতে হবে—অথচ যত শীঘ্র বাড়ী পৌঁছুতে পারা যায় সেইটির এখন দরকার।......অনেক গবেষণার পর নৌকায় যাওয়াই তাঁরা সাব্যস্ত করলেন। গঙ্গার ঘাটে এসে দর কষাকষি ক'রে স্থির হলো বটে কিন্তু রাত্রের মধ্যে যে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবে সে ভরসা তারা দিতে পারলোনা;...যা হোক, আমরা নৌকায় উঠে বসলাম তারাও বাঁধন খুলে পাল তুলে দিলে।

গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় বেশ আবেগ আস্‌তে লাগলো— ছইয়ের মধ্যে তক্তার ওপর শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—যখন জাগলাম, তখন বেলা অনেক হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে একটা বৈকাল, একটা রাত্রি যে বেমালুম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি, শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম! বাইরে বেরিয়ে দেখি, তীরের পুরাতন ঝাউগাছগুলি আজও তেমনি বাতাসে শোঁ শোঁ করছে, চুপ ক'রে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি, অনিলের ডাকে ফিরে দেখি ঘাটে এসে প'ড়েছি।

চুপচাপ ওপরে উঠে রাস্তায় নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা অসম্ভব রকম চীৎকার শুনে,—"বলো হরি, হরি বোল!"......

মোটা অশথ গাছটার পাশ দিয়ে যে সরু পথটা গঙ্গার ধার দিয়ে শ্মশান ঘাটের দিকে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে দেখি আনন্দবাবুর মতো কে যেন টল্‌তে টল্‌তে বীরেনবাবুর সঙ্গে যাচ্ছেন, আর তাঁদের একটু আগে আগে কতকগুলি লোক কি একটা ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে ;...কি জানি কেন থম্‌কে দাঁড়ালাম।

এভাবে আমাকে থাম্‌তে দেখে পিছন থেকে অনিল পাশে এসে আমার হাত ধ'রে বাড়ী যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। অনিলের মুখের দিকে মূকের মতো ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলাম,......হঠাৎ তার 'পরে ভয়ানক রাগ হ'লো,—ধমক্ দিয়ে বললাম, "কি ছেলেমানুষী করছো অনিল, ছেড়ে দাও!" বলে জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে দৌড়ুতে লাগলাম।—যেন যথাসর্ব্বস্ব আমার চুরি হ'য়ে যাচ্ছে!...

তারপর ?......

তারপর সেখানে গিয়ে যে নৃশংসতা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে গেলো,—চারি পাশের এতো আলো ,এতো বাতাস চ'ক্ষের পলকে কে যেন গাঢ় কালো পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে ফেল্‌লে,—দম বন্ধ হ'য়ে এলো—চীৎকার ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেলাম !......

এরপর যখন জ্ঞান হ'লো তখন দেখি আমি আর একটা জগতে এসে পড়েছি,—এখানে আমি উন্মাদ—পাগল !...... যে গগনস্পর্শী লোল-জিহ্বা বিস্তার ক'রে লেলিহান বহ্নি জ্বলে উঠেছিলো—দেখতে দেখ্‌তে আবার নিভেও গেলো,—প'ড়ে রইলো শুধু ছাই আর ভস্ম,—সত্যই কি তাই ?......



অভিশপ্ত

—১—

গভীর রাত্রি। প্রকৃতি সতী আজ যেন কি এক অজ্ঞাত অবসাদে উন্মাদিনী,—পাগলপারা, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্যা! বৈশাখ আজ যেন সত্য সত্যই প্রকৃতিদেবীর সাথে একযোগে সংহার মূর্ত্তিতে ধরায় প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছেন,—জীব-জগৎ সে দুর্বিসহ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ,—গতিহারা;—যেন প্রাণহীন—অসাড়!...হাতের পাঁচটী আঙুলও গোনা যায় না—সে অন্ধকার এতই জমাট,—যেন বিধাতার অভিসম্পাতের মতোই তা দুর্ভেদ্য।—শুধু সেই নিকষ কালো আঁধারের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক্ যেন চপলার চোরা হাসির মতোই এক আকাশের প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলে যাচ্ছে!

এমনি প্রলয়-নৃত্যের মাঝে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মতোই পরাগ তার সবল বাহু দুটী দিয়ে কি একটা ভারী জিনিষ বুকে চেপে ধরে দ্রুত পদে ছুটে চলেছে;—যেন তার ঐ ধরা জিনিষটী ছিনিয়ে নেবার জন্যে প্রতি ঝঞ্ঝাটীও প্রস্তুত! অথচ তার চলার প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছে তার সাবধানতার যেন অন্ত নেই। ধূর্ত্ত

জিনিষটাকে সে এতো সন্তর্পনে এতো সাবধানে বুকে চেপে ধরেছে যেন মা তাঁর একমাত্র বুকের দুলালকে এই বিশ্বগ্রাসী দুর্য্যোগের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের বুকের নিভৃত কন্দরে স্থান দিয়েছেন,—যাতে সে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয় পায়—যেন আঁচড়টিও লাগতে না পারে। পরাগের বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ শরীর বাত্যাহত হ'য়ে টলে পড়ছে, বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ফের দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে থাকে, শীতে সারা দেহ সঙ্কুচিত হ'য়ে মাটীর মধ্যে লুটিয়ে পড়তে চায়,—তবু সে অমানুষিক শক্তি নিয়ে এই ঝড়-জল তুচ্ছ ক'রে গন্তব্য স্থানে পৌছুবেই—এই যেন তার প্রতিজ্ঞা!......

কিন্তু পা যে আর চলে না!...এক এক ফোঁটা জল মনে হচ্ছে কে যেন পরাগের অনাবৃত পৃষ্ঠে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। এমনি কিছুক্ষণ চলার পর সে আর পারে না—ক্লান্ত কণ্ঠে সর্ব্বহারার মতো বলে উঠলো,—"ভগবান, তুমি আছো কি নেই তা এই ছাব্বিশ বছরের মধ্যে একটী দিনও তা বিশ্বাস করিনি,—কিন্তু, কিন্তু ভগবান, যদি থাক, যদি তোমার কোন শক্তি থাকে, তা হ'লে আর একটু বল দাও—আর একটীবার আলো দাও!......"

—কক্কড় কড়াৎ!—হঠাৎ, ভীষণ শব্দে কোথায় যেন লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠ্‌লো!—এ শব্দে অন্য কেউ হলে হয়তো বা মূর্চ্ছিত-ই হ'য়ে পড়তো কিন্তু পরাগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হওয়া তো দূরের কথা যেন প্রাণের মধ্যে নূতন প্রেরণা অনুভব করলো,—চীৎকার ক'রে সে বলে উঠ্‌লো,—"আর একবার আর একবার!"...... আবার সেই বিদ্যুতের চমক্!

সেই ক্ষণিকের আলোয় পরাগ অদূরে একটী বাড়ী দেখতে পেলে, তার মনে হ'লো ঐ বাড়ীটী যেন তার বড়ই প্রিয়,—বড়ই আপনার,—অথচ যেন শত্রুপুরী ;—নিদের বাগান মতোই মোহনীয় ও দহনীয়।

—২—

পরাগের না ছিলো কি ? তার ছিলো পিতা-মাতা, ভাই, ভগ্নী, অতুল ধনসম্পত্তি, তা ছাড়া ছিলো অপূর্ব্ব রূপ, অনন্যসাধারণ মেধা, অগাধ বিদ্যা, সর্ব্বোপরি অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু সবই তার ব্যর্থ হ'লো সেই দিন যে দিন সে চলার পথের সন্ধান পেলে... ...সত্যই কি তাই ? কেউ কেউ বলেন,—"পরাগ একজন মস্ত বড় এ্যানার্কিষ্ট"; কেউ কেউ বলেন,—"ওর গুপ্ত ডাকাতের দল আছে"; কতক বলেন,—"ও সব স্বদেশ ফদেশ মিছে কথা......" এমনি অনেক কিছুই সুনাম ও দুর্নাম তার ছিলো, কিন্তু যেদিন সে

কারাবাসের ছাপ নিয়ে গ্রামে ফিরে এলো সেদিন অনেকেই হলফ্ ক'রে বল্‌তেন যে, পরাগের মতো দুর্দ্দান্ত দস্যু এ-তল্লাটে আর জন্মায়নি। সে নাকি দু'দুটো পিস্তল নিয়ে দিন দুপুরে সহরের বুকের 'পরে গভর্ণমেণ্টের কোষাগার লুট করতেও পেছ্‌পা হয় না!

পরাগ এসব কথা গায়েও মাখে না, কানেও তোলে না।—এ সমস্ত ছাপিয়ে তার এই কথাটাই বারবার মনে হ'তো,—অপরাধ কার?......কার দোষে আজ সে দোষী?......

জেলখানায় ব'সে যখন সে শুন্‌লে ও-পাড়ার হরিশের সাথে মীণার বিয়ে খুব ধুম-ধামের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং মীণা তার স্বামীর ঘরে, তখন তার মুখখানা মরা মানুষের মতোই শাদা হ'য়ে গেলো,—বুকের কোথায় যেন একটা ব্যথার মতো বেজেও ছিলো কিন্তু সে শুধু নিমিষের জন্য; নিজেকে বেশ কঠিন ক'রে এ সংবাদ উল্লাসের সাথেই গ্রহণ করলে সে।...কিন্তু?...কিন্তু সেদিন যে ব্যথাটা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো সে ব্যথাটা যে তার পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাসের চেয়েও হাজার হাজার গুণ বেশী, তা শুধু তার অন্তর্যামী ছাড়া সে নিজেও টের পায়নি।

মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করতো, "আচ্ছা, সে কি মীণাকে কোন দিন কামনা করেছিল?" মন উত্তর দেয়—"কৈ, না তো!... তাকে তো ঠিক বোনের মতোই স্নেহ করতাম, শিষ্যার মতোই দেখতাম। কিন্তু, কৈ?...না—না, আমার ব্রততো সাধারণ মানুষের মতো নয়। আমার ব্রত যে এই দিনটাকে দুপায়ে দলে

পিষে ধূলার মতোই উড়িয়ে দিয়ে আগের পানে চল্‌তে বলে।...
আমি তো কোন দিন...না—না গো।..."

জেল থেকে ফিরে এসে সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেলো,—কিন্তু, কিন্তু তা করলে কি হয়?—ঘরে বাইরে সব স্থানে সে যে মূর্ত্তিমান মহামারী! পিতা-মাতা-আত্মীয়-স্বজন-পাড়া-পড়শী সকলের কাছে সে যেন গোপন ব্যাধির মতো,—যেমন ঘৃণ্য তেমনি হেয়। সকলেই দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

এক একবার মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ভাবে,—"কেন এই ভূতের ব্যাগার খেটে মরা? কেউতো আমায় চায় না!—তা না চাক, কিন্তু আমার কাজগুলি যদি এরা প্রীতির চোখে দেখ্‌তো"—তখন তার কর্ত্তব্য বুদ্ধি তাকে উত্তেজিত করে বলে,—তা কি কখন হয়? শরীরে যার হাজার হাজার বছরের বিস্ফোটক কায়েমী করে বাসা বেঁধেছে—রুগী তো তার ব্যথা টের-ই পায় না। আজ তুমি যদি তার সেই সহা ব্যথাটাকে অস্ত্র করতে যাও সে যে তোমার এই উপকারটুকুকে অযথা অত্যাচার বলে ধরবে—এ আর বেশী কি? কিন্তু তাই বলে যদি তুমি থেমে যাও, এই থামার পরিণামটা যখন ভাব্‌বে তখন তোমার নিজের ওপরেই ধিক্কারের আর সীমা থাক্‌বে না!

কিন্তু—! কোথায় কে ক্ষীণ অথচ বেশ সহজ কণ্ঠেই এ সমস্ত ছাপিয়ে বলে ওঠে—কিন্তু!

—৩—

মীণা স্বামীর বুকের কাছে নিজের মুখ এনে বললে,—"আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।" হঠাৎ তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। কি এক অজ্ঞাত আতঙ্কে হরিশের মুখের পানে মূকের মতো চেয়ে রইলো।—তার ভীত ত্রস্ত চোখ দুটো ছাপিয়ে অশ্রু টল্ টল্ করতে লাগলো।

হরিশ তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা-মাখা স্বরে বললে—ভয় কি মীণা! আমার সাথে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে তা ছাড়া পিস্তল রয়েছে। আর আজকের রাতটা বই তো নয়!"

মীণা কি বলতে যাচ্ছিলো, দাসী এসে পড়ায় থেমে গেলো।

দাসী বললে, "দাদাবাবু সাহেবের দরোয়ান এসেছে।"

হরিশ যেতে যেতে মীণার ভয়-কাতর মুখের দিকে চেয়ে বললে,—"ভয় কি?"

* * * * *

একে এই অজ পল্লীগ্রাম,—না আছে দু'টো মানুষের মতো মানুষ, না আছে দু'টো ভাল বাড়ী। ঐ একটা কাছারী বাড়ী

যা সকল বাড়ীর চেয়ে ভাল, তা সে কবে কোন যুগে তৈরী হয়েছিলো দেখে কেউ তা' নির্ণয় করতে পারে না—এমনি তার শ্রী। এ হেন বাড়ীতে খাস বিলাতী সাহেব পুলিশ ইন্সপেক্টর আজ মাসাবধি হ'লো বাস করছেন, তিনি যেমন হাঁপিয়ে পড়েছেন, তেমনি শ্রান্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মন স্ফূর্ত্তির অভাবে। অকর্ম্মণ্য পুলিশ কর্ম্মচারী হরিশ যখন দুর্দ্দান্ত দস্যুদের কোন কূল কিনারা করতে পারলে না তখন তিনিই একমাত্র এই অকূলে হাল ধরতে এখানে এসেছেন। এবং ডাকাতের সন্ধান করতে করতে তিনি এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেলেন যা তাঁর বয়স, জাতি, কুল মান সমস্তই ছাপিয়ে উঠলো। তাই দস্যুদের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের অসুস্থতা জানিয়ে শুধু হরিশের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের হাল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

• • • • •

নিশুতি রাত্রে হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে মীণা ভাবলে তার স্বামী ফিরে এলেন। ব্যস্ত হয়ে যখন শয়ন ঘরের দ্বার খুলে সে বাইরে এলো তখন চোখের পলকে দুজন লোক তাকে ধরে হাত মুখ বেঁধে ফেললো। হঠাৎ এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় চীৎকার করা তো দূরের কথা তার মুখ দিয়ে একটা শব্দ পর্য্যন্ত ফুটলো না।—কেমন যেন জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে অজ্ঞানের মতো নির্জ্জীব হয়ে গেলো। সে বেশ দেখতে পেলে তাদের একজন তাকে ধরে রইলো অপর লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে সমস্ত জিনিষ ওলোট পালোট করে

টাকা পয়সা মূল্যবান জিনিষ পত্র যা কিছু পেলো সমস্তই একটী পুঁটলিতে বেঁধে সেই আসন্ন দুর্য্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো—এখন সে যথার্থ-ই জ্ঞান হারালো। তার দাস-দাসী পুলিশ সমস্তই তো ছিলো কিন্তু এত বড়ো যে একটা ডাকাতী নিঃশব্দে সমাধা হয়ে গেলো—তার মূল কোথায় ?

— ৪ —

মীণা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখে তার পাশে! কে একজন সাহেব বসে তার দিকে কি এক রকম ভাবে চেয়ে আছে, আর একটী বয়স্কা স্ত্রীলোক তাকে হাওয়া করছে। হঠাৎ তার নজর দ্বারের দিকে পড়তে দুজন ভীষণ আকৃতি মানুষ দেখ্‌তে পেলে—তার সমস্তই মনে পড়লো,—সে ভয়ে চীৎকার করে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠে পড়লো—কিন্তু তার সে চীৎকার

বাইরের উন্মাদিনী প্রকৃতির কাছ থেকে যেন আহত হ'য়ে ফের ঘরের মধ্যেই ফিরে এলো।

সাহেব প্রথমে থতমত খেয়ে গেল, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে মীণার কাছে গিয়ে একেবারে শিকারী বাঘের মতো তাকে জাপটিয়ে ধরলে। মীণা চীৎকার করে উঠলো কিন্তু তার অর্দ্ধোচ্চারিত স্বর ছেড়ে গর্জ্জে উঠলো—"গুড়ুম!"

"ও গড্!" বলে সাহেব মাটীতে লুটিয়ে পড়লেন। দ্বারের দিকে চেয়ে মীণা একটী লোককে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে,—"পরাগদা তুমি !" বলেই তার পায়ের তলায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

পরাগ মীণাকে কোলে করে বাইরে বেরিয়ে এল – একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের দুজনকেই দুলিয়ে দিলো—মীণা ব্যগ্র স্বরে বললে,— "কি হবে পরাগ দা?"...

পরাগ একবার সেই অন্ধকারের প্রতি চেয়ে মীণার দিকে ফিরে বললো,—"আমরা এখানে নিরাপদ নই মীণা!...তোমাকে তোমার বাড়ী পৌঁছে আমি দিতে পারি যদি ভয় না পাও।" বলে তার দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে চাইলো, কিন্তু অন্ধকারে মীণা তার মুখ দেখতে না পেয়ে ধীরে ধীরে পরাগের কাছে সরে গিয়ে বললে "পরাগদা, আমি পারবো তোমার সাথে যেতে।"

ছোট শিশুর মতোই পরাগ মীণাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো। প্রতি মুহূর্ত্তে তার পদস্খলন হচ্ছিলো;—শীতে তার প্রতি অনুপরমাণু পর্য্যন্ত যেন নিস্তেজ হয়ে

আসছিলো। মীণাকে তার প্রশস্ত বুকের আড়াল করে সত্য সত্যই সে উল্কার মতো ছুটে চল্‌লো।..... নিজের শেষ রক্তবিন্দুটীকে দিয়ে যেন সে তার এই অশেষ স্নেহের পাত্রীটিকে রক্ষা করতে চায়,—নিজের দেড় হাত চওড়া বুক দিয়ে —না না, সে যে মায়ের দাস, তার নিজের বলে কিছু নেই, —না-না, থাকতেও নেই গো! এ শুধু বিপন্না নারীকে—আর্ত্তকে রক্ষা করাই যে তার প্রধান কর্ত্তব্য!

কিছুক্ষণ জল ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করার পর পরাগ ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো,—পা দু'টো যে বিশ মণ বোঝা! উঃ, কী অন্ধকার! বিশ্বের অন্ধকার তার পথরোধ করবার জন্যেই কি তার চার পাশে জমা হ'য়েছে?

হঠাৎ তার শ্বাস রোধ হ'য়ে আসতে লাগলো, এমন সময় মীণা তার বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। সে জলমগ্নের মতো মাথাটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আকুল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো,—"ভগবান, তোমায় তো কোনদিন ডাকিনি,—আছ কি নেই তাও বিশ্বাস করিনি—যদি থাক, যদি পাপ পুণ্যের বিচারক থাক, তা হ'লে এই আর্ত্ত নারীকে—হাঁ গো হাঁ, তার কাছে শুধু আর্ত্ত নারী, তার প্রাণ রক্ষা কর। তার পর আমায় যদি অনন্ত নরকে নিয়ে যাও, তাও যেতে রাজী!"

* * * * *

রাত্রিশেষে মীণার সিক্ত অর্দ্ধমৃত দেহখানি নিয়ে যখন টল্‌তে টল্‌তে পরাগ মীণার শয়ন কক্ষে এলো তখন সেই আধ উজ্জ্বল

কক্ষে দেখে কে একজন পিস্তল হাতে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—কি ভেবে সে ফিরতে যাবে অকস্মাৎ "গুড়ুম" শব্দে পাগলের পিস্তল গর্জে উঠলো, "উঃ!" বলে পরাগ মাটিতে পড়ে গেলো। মীণা সে পড়ে যাওয়ার ঝাঁকুনি পেতেই তার লুপ্ত-জ্ঞান যেন ফিরে পেলো, সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেই পরাগ উঠবার চেষ্টা করছে দেখে "গুড়ুম" শব্দে পিস্তলের গুলি তার বক্ষ ভেদ করলো সঙ্গে সঙ্গে সে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পাগলের দিকে চেয়ে মীণা আকুল কণ্ঠে বলে উঠলো, —"এ কি করলে স্বামী!"—তার স্বর বন্ধ হয়ে এলো, মাথা ঘুরে সে ছিন্ন মূল লতার মতো পরাগের দেহের 'পরে লুটিয়ে পড়লো।

"আঃ!" একটা দীর্ঘ শ্বাসের সাথে সাথেই তার জীবনও যেন অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেলো—তার জীবনের সমস্ত পথ বিপথ, আশা আকাঙ্ক্ষা ছাপিয়ে অন্তর্যামীর এইটুকুই কি কাম্য ছিল? এই টুকুই কি তার অভিশপ্ত জীবনের সাধনা?—কে বলবে এর মূল কোথায়?

সমাপ্ত